Vol. 60 | No. 1-2 | 2025

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বুদ্ধদেব বসুর নাটক: বিষয় ও শিল্পরূপ

Volume	60
Issue	1-2
Year	2025
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Gautam Datta
Published online	August 20, 2025
DOI	10.62328/sp.v60i1-2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v60i1-2.3
Pages	35-55
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা
Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ১-২
ফাল্গুন ১৪৩১॥ ফেব্রুয়ারি ২০২৫
প্রকাশকাল: আগস্ট ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v60i1-2

DOI: 10.62328/sp.v60i1-2.3
প্রবন্ধ জমাদান: ৩ নভেম্বর ২০২৪
প্রবন্ধ গৃহীত: ১৫ মে ২০২৫
পৃষ্ঠা: ৩৫-৫৫

বুদ্ধদেব বসুর নাটক: বিষয় ও শিল্পরূপ

গৌতম দত্ত
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: dattarub@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪) রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের একজন গুরুত্বপূর্ণ লেখক। তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম উদ্যোক্তাও বটে। এ কারণে কবিতা, কথাসাহিত্য, প্রবন্ধ, নাটক, অনুবাদ, সম্পাদনা, সমালোচনাসহ সাহিত্যের প্রায় প্রতিটি শাখায় তাঁর মৌলিক প্রতিভার স্বাক্ষর থাকলেও তিনি মূলত কবি হিসেবে বেশি পরিচিত। বুদ্ধদেব বসু বিশ্বসাহিত্যের পাঠ ও প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাটককেও সমৃদ্ধ করেন। তিনি মৌলিক নাটকের পাশাপাশি চিরায়ত সাহিত্যের নানা আখ্যানকে সমকালীন যুগমানসে নাট্যরূপ দেন—যা বাংলা নাট্যসাহিত্যকে 'আধুনিক' করে তুলতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। নাট্যকার হিসেবে বুদ্ধদেব বসুর এই কৃতিত্ব বর্তমান প্রবন্ধটিতে আলোচিত হবে। সেক্ষেত্রে তাঁর রচিত নাটকসমূহের বিষয় ও শিল্পরূপ বিশ্লেষিত হবে।

মূলশব্দ

পুরাণ, বিনির্মাণ, আধুনিকতা, যুদ্ধ, স্মৃতি, কাব্যনাট্য, দ্বন্দ্ব, প্লট, গতি, চরিত্র।

১

বিশ শতকের ত্রিশের দশকে ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও দেশাত্মবোধের প্রেরণায় বাংলা ঐতিহাসিক নাটক লেখার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। ভারতের রাজনৈতিক ঐতিহ্য থেকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্রকে এক্ষেত্রে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) ভাববাদী প্রতীক ও রূপকধর্মী নাট্যধারার বিপরীতে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৯২-১৯৬১) লেখেন *গৈরিক পতাকা* (১৯৩০), *সিরাজদৌল্লা* (১৯৩৮), *রাষ্ট্রবিপ্লব*; মন্মথ রায় (১৮৯৯-১৯৮৮) লেখেন *অশোক* (১৯৩৩), *মীরকাশিম* (১৯৩৮); মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৫৪-১৯৩২) লেখেন *টিপু সুলতান*। এসব নাটক স্বাধীনতাকামী ভারতবাসী বিশেষ করে বাঙালি জনগোষ্ঠীকে উজ্জীবিত করেছিল। কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর যুগে চল্লিশের দশকে বাংলা নাটকের ইতিহাসনির্ভর এ ধারাটির পরিবর্তন হয়।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ও ফ্যাসিবাদী আক্রমণ শুরু হয়। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে যুদ্ধের সঙ্গে। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত সংঘটিত এ যুদ্ধের ভেতরেই ১৯৪৩ সালে বাংলাজুড়ে মহাদুর্ভিক্ষ ঘটে। এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ'র (১৯৩৬) বঙ্গশাখা 'ফ্যাসিস্টবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' (১৯৪২) এবং এর সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ' (১৯৪৩) প্রতিষ্ঠিত হয় (ধনঞ্জয়, ১৯৯২: ১৯)। এ গণনাট্য আন্দোলনে বিজন ভট্টাচার্যের (১৯০৬-১৯৭৮) *আগুন* (১৯৪৩), *নবান্ন* (১৯৪৪), বিনয় ঘোষের (১৯১৭-১৯৮০) *ল্যাবরেটরী*, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের (১৮৮৯-১৯৫৪) *হোমিওপ্যাথী* নাটক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে (জাকিরুল, ২০০৭: ৯-১০)। বঞ্চিত, শোষিত মানুষের করুণ বাস্তবতা ও উজ্জীবনের প্রেক্ষাপটে এসব নাটক যখন অভিনীত হচ্ছে, তখনই শুরু হয় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬), ভারতবিভাজন (১৯৪৭) এবং এর ফলে সৃষ্ট মানুষের মৌলিক সংকট। বাংলা নাটক তার নাট্যমঞ্চে এ সংকটকেও সঙ্গী করে নেয়।

তবে একইসঙ্গে রাজনৈতিক আদর্শের বাইরে শিল্পীর স্বাধীনতার প্রশ্নে শুরু হয় 'নবনাট্য আন্দোলন'। পঞ্চাশের দশকে লেখা দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *মোকাবিলা* (১৯৫০), *মশাল* (১৯৫০); তুলসী লাহিড়ীর (১৮৯৭-১৯৫৭) *ছেঁড়া তার* (১৯৫০), *বাংলার মাটি* (১৯৫৩); সলিল সেনের *নতুন ইহুদী* (১৯৫১), *মৌচোর* (১৯৫৭); ঋত্বিক ঘটকের *দলিল* (১৯৫১) প্রভৃতি নাটক সেই নবনাট্য আন্দোলনের ফসল। এসব নাটকে বিভাগপূর্ব ও বিভাগোত্তর ভারতবর্ষের বিশেষত বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক সংকটগুলো মঞ্চস্থ হতে থাকে। বিশ শতকের ষাটের দশকে এইসব সংকটের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের নাটকে যুক্ত হয় মার্কসীয় চেতনার উজ্জীবন। বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) নাটক এই সময়াবর্তে পরিপুষ্ট হয়েছে।

১.১

বিশ শতকের বিশের দশকে (১৯২০-১৯২৯) বুদ্ধদেব বসুর নাটকে হাতেখড়ি হলেও ত্রিশ, চল্লিশ ও পঞ্চাশ পেরিয়ে ষাটের দশকে এসে তিনি তাঁর নাট্যপ্রতিভার পূর্ণ প্রকাশ ঘটান। কবি-কথাশিল্পী-সাহিত্যসমালোচক বুদ্ধদেব বসুর শিল্পীসত্তার ভেতর থেকে ত্রিশের দশক

থেকেই মাঝে মাঝে যে নাট্যসম্ভাবনা দেখা দিতে থাকে, এ দশকে এসে তা পূর্ণ সত্তায় বিকশিত হয়। মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) অন্যান্য রচনার পাশাপাশি মাত্র তিন বছরে (১৮৫৯-১৮৬১) তিনটি নাটক ও দুটি প্রহসন রচনা করে বাংলা নাট্যসাহিত্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তেমনি বুদ্ধদেব বসু তাঁর বত্রিশটি[১] নাটকের মধ্যে ষোলটি নাটক ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সাল এই পাঁচ বছরে রচনা করে বাংলা নাট্যসাহিত্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

পঞ্চাশের দশকে (১৯৫০-১৯৫৯) বুদ্ধদেব বসু মাত্র একটি নাটক (*দালিয়া* ১৯৫৪) লিখেছেন। ১৯২৯ থেকে ১৯৪৪ এই সময়পর্বের পনেরোটি নাটক মূলত তাঁর রচিত বিভিন্ন গল্প-উপন্যাস ও বিচ্ছিন্ন ভাবানুষঙ্গের নাট্যরূপ। সময়টি তাঁর নাট্যজগতে প্রবেশের প্রস্তুতিকাল। এই প্রস্তুতি ও প্রায় দীর্ঘ ত্রিশ বছরের (১৯২৯-১৯৬০) সাহিত্যজীবনের অভিজ্ঞতা নিয়েই এক পরিণত নাট্যকার হিসেবে বুদ্ধদেব বসু আত্মপ্রকাশ করেন। নাট্যসমালোচকের মন্তব্যও এমন:

> কবি ও কথা-সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু জীবনের শেষ পর্যায়ে নাটকের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। কবিতা ও উপন্যাসে তিনি ছিলেন অতি আধুনিকতার উদ্ধত পতাকাবাহী, প্রাচীন রক্ষণশীলতাকে বেপরোয়া আঘাত করিয়া তিনি পাইতেন এক কালাপাহাড়ী আনন্দ। কিন্তু পরিণত বয়সে তিনি [বুদ্ধদেব] প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য ও পুরাণে বিচরণ শুরু করিলেন। আশ্চর্য বই কি! আর ভাবে ও ভাষার জাত-রোমান্টিক লেখক প্রাচীন ক্লাসিক নাটকের রূপ ও রসের সন্ধানী হইলেন এও বিস্ময়ের বিষয়। (অজিত ২০১৬: ৪৬৪)

বুদ্ধদেব বসু রচিত নাট্যকর্মের 'বিস্ময়ের এই বিষয়গুলো' বর্তমান প্রবন্ধে আলোচিত হবে। সেখানে বুদ্ধদেব বসুর নাটকের বিষয় হিসেবে বিশেষ করে প্রকৃতি, প্রেম, দাম্পত্যজীবন, নিঃসঙ্গতা, শ্রেণি, সমাজ, যুদ্ধ; এবং শিল্পরূপ হিসেবে বুদ্ধদেবের নাটকে আখ্যানের বিনির্মাণ, কাব্যনাট্য, গতি, দ্বন্দ্ব, প্লট, সংলাপ, রস, অঙ্কবিভাজন, চরিত্রনির্মাণের ধরন প্রাধান্য পাবে। এই বিশ্লেষণে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত বুদ্ধদেব বসুর বত্রিশটি নাটকই আলোচিত হবে।

২

বুদ্ধদেব বসুর *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* (১৯৬৬), *সত্যসন্ধ* (১৯৬৭), *অনাম্নী অঙ্গনা* (১৯৭০) নাটকে প্রকৃতি বিশেষ তাৎপর্যে উপস্থাপিত। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকের শুরুতে গ্রামের মেয়েরা রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারসংলগ্ন পথে দাঁড়িয়ে বিপর্যস্ত প্রকৃতির কথা প্রকাশ করেছে। সেখানে মেয়েরা বলেছে:

> আকাশে সূর্যের অটল আক্রোশ, জ্বলছে রুদ্রের রক্তচক্ষু,
> মাটির ফাটে বুক, শুকনো জলাশয়, ধুঁকছে নির্বাক পশুরা;
> শস্যহীন মাঠ, বন্ধ্যা সধবারা, দিনের পর দিন দীর্ণ, শূন্য—
> বৃষ্টি নেই! (বুদ্ধদেব ২০১৩: ৯)

নাটকটির শুরুতে এমনই বৃষ্টিহীন, বিশুষ্ক এক মরুময় প্রাকৃতিক চিত্র বর্ণিত হয়েছে। এই অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ আসন্ন। গ্রামবাসীর কর্মহীন সময় কাটে। তাদের সন্ধ্যায় এখন আর শান্তি নামে না। 'সত্যসন্ধ' নাটকে জয়ানন্দের তিন হাজার টাকা মাইনের কথা শুনে এই 'দুর্ভিক্ষের দেশে' দ্বিতীয় ছাত্র সন্দেহ প্রকাশ করেছে। এমনকি দ্বিতীয় প্রৌঢ়ের দুশ্চিন্তার অন্যতম কারণ অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টি। এ সবই আসলে টি এস এলিয়ট কথিত 'A heap of

broken images'. (2016: 34) 'The Waste land' কবিতায় এলিয়টও এমন ইমেজ সৃষ্টি করেছিলেন:

> ... where the sun beats,
> And the dead tree gives no shelter, the cricket norelief,
> And the dry stone no sound of water.
> Only there is shadow under this red rock,
> (2016: 34-35)

এই চিত্র ছাড়াও বুদ্ধদেব বসুর নাটকে প্রকৃতির সজীব চিত্রও উদ্ভাসিত। 'অনাম্নী অঙ্গনা' নাটকে বুদ্ধদেব বসু ফাল্গুন মাসের সজীবতার ভেতরে এক রোমান্টিক আবহ প্রকাশ করেছেন। ফাল্গুন মাসের উজ্জ্বল সূর্যালোক আর স্নিগ্ধ বাতাস সত্যবতীকে প্রভাবিত করেছিল। স্বয়ং মুনি পরাশরও প্রভাবিত হয়েছিলেন। এমনই প্রাকৃতিক আবহে নৌকার দাঁড় টানায় রত সত্যবতী অনুভব করেছিলেন মুনি পরাশরের দৃষ্টি 'দাঁড়ের ছন্দে আন্দোলিত' তাঁর অনাবৃত বাহুতে, কটিতটে, তালে তালে বিস্ফারিত ও সংকুচিত স্তনমণ্ডলে। এ কারণেই এ নাটকে অঙ্গনার তৃতীয় সখী হিরন্ময়ী অঙ্গনাকে বলেছে:

> এই যৌবনকাল—ফাল্গুন মাস:
> পথ চলতে প্রণয়
> জল তুলতে প্রণয়,
> পায়ে-পায়ে তাই বিপদ, তাই ভয়। (বুদ্ধদেব ২০১৩: ১৭৯)

বুদ্ধদেব বসুর নাটকে প্রকৃতি যতটুকু স্থান জুড়ে আছে তা নাট্যকাহিনির ভাবসত্যকে পূর্ণভাবে প্রকাশের জন্য। অবশ্য নাটকে প্রাকৃতিক ভাবালুতাকে দীর্ঘস্থায়ী করার সুযোগ সাধারণত কম থাকে। এ কারণে বুদ্ধদেবের নাটকে প্রকৃতির রুক্ষ, কঠোর কিংবা কোমল আবহ নাটক তিনটিতে কাহিনির উৎসমুখ ও অনুষঙ্গ হিসেবে উপস্থাপিত হয়েছে। তবে তা সংক্ষিপ্ত পরিসরে। কেননা বুদ্ধদেব বসুর নাটকের মূল লক্ষ্য বহিঃপ্রকৃতি নয়, বরং মানুষের মনোজগতের অন্তঃপ্রকৃতি।

২.১

বুদ্ধদেব বসুর নাটকের একটি অনুষঙ্গ প্রেম। তবে প্রেমের সরল ও শাশ্বত রূপের চেয়ে তুলনামূলকভাবে জটিল রূপটি বুদ্ধদেবের নাটকে বেশি প্রতিভাত হয়েছে। নাট্যকার তাঁর নাট্যজীবনের শুরুতে *একটি মেয়ের জন্য* (১৯২৯) নামে যে একাঙ্ক নাটক লেখেন, তা এক নবযুবকের রোমান্টিক ভাবচেতনা থেকেই উৎসারিত। ঢাকার পুরানো পল্টনে থাকাকালে 'এক সদ্যযৌবনা প্রতিবেশিনীকে কেন্দ্র করে রচনা করেন নাটকটি' (অপূর্ব ২০১১: ১২)। নাটকে মেয়েটির প্রেমিকসহ গৃহত্যাগ এবং সেই গৃহত্যাগকে কেন্দ্র করে নাট্যরস জমে ওঠে। এমনকি *রাবণ* (১৯৩০) নাটকে দম্ভ আর অহংকারে পরিপূর্ণ রাবণের মধ্যেও এক প্রেমিক-রাবণ প্রকাশ পেয়েছে। সেখানে রাবণের প্রথম তপস্যা শিবের জন্য আর দ্বিতীয় তপস্যা ও অপেক্ষা সীতার জন্য। 'রাবণ দশ সহস্র দেব-কন্যাকে সম্ভোগ করেছে, কিন্তু ভালো সে বেসেছিলো একজনকেই, যাকে সে সত্যি-সত্যি কখনো স্পর্শ পর্যন্ত করেনি' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ৪৪৫)। এ কারণেই রাবণ বলেছে, '... জয় করব সীতাকে, আমার রূপে নয়, আমার ঐশ্বর্যে নয়, আমার দুর্বার শক্তি দিয়ে নয়, আমার প্রেম দিয়েই তাকে জয় করব' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ৪২১)। এ

কারণে নাটকটিতে রাবণ 'কোনো দুরাত্মা নয়। বরং অশোক বনে বন্দিনী সীতার হৃদয় জয়ের সংগ্রামে একনিষ্ঠ প্রেমিক' (অপূর্ব ২০১১: ১৩)।

অনেক রকম (১৯৩৩) নাটকে আয়নার জন্য মুকুলের লজ্জামিশ্রিত ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু আয়না, লতা, বুবুল এরা ক্রমশ কিকিরার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে সামাজিক সংস্কারের ঊর্ধ্বে উঠে *রুণু ও লোটুর প্রেম* (১৯৩৩) নাটকে বড় হয়ে উঠেছে রুণু ও লোটুর প্রেম। সেই প্রেম এতটাই অনুভূতিসম্পন্ন যে লোটু বলেছে, 'আমাদের একটি করে' হৃদয় আছে মোটে; ও-বস্তুটিকে একটু সাবধানে রাখাই ভালো, নয় কি?—ওঃ বিয়ে! বিয়ে! বিয়ে! বিয়ে কথাটার মানে কী, রুণু?' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ৪৮৫)।

তপস্বী ও তরঙ্গিণী নাটকে এই বিয়ের সঙ্গে প্রেমের বাস্তবতা দেখানো হয়েছে বিস্তৃত পরিসরে। সেখানে শান্তা-অংশুমানের প্রেমের এক প্রবল রূপ দেখতে পাওয়া যায়। শান্তা সরলভাবেই সেই রূপদর্শন করেছেন। শান্তা বলেছেন, 'অংশুমান ও আমি এক যৌবরাজ্য পেতেছি। আমাদের মন্ত্রী সেখানে হৃদয়, সেনাপতি আমাদের পারস্পরিক প্রীতি, কোষাধ্যক্ষ আমাদের নিষ্ঠা, আর প্রজাগণ আমাদের দৃষ্টি, হাসি, সংলাপ, আমাদের স্বপ্ন ও ভাবীকল্পনা' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ১৭)। এই 'ভাবীকল্পনা'কে তাঁরা দুজন দীর্ঘদিন ধরে লালন করেছেন। অন্যদিকে নির্জন বনের ভেতর ঊষালগ্নে সূর্যপ্রণামরত তপস্বীযুবক ঋষ্যশৃঙ্গকে দেখে ও তাঁর নিষ্পাপ প্রশংসাবাণী শুনে রোমান্টিক ভাবালুতায় তরঙ্গিণী আবিষ্ট হয়। আর তরঙ্গিণীর 'নির্ধূম হোমানল' দেহ দেখে স্বয়ং ঋষ্যশৃঙ্গ পুলকিত হন। নাটকটির শেষ পর্যন্ত প্রথম দিনের এই দর্শনস্মৃতি ঋষ্যশৃঙ্গ ও তরঙ্গিণী উভয়েই ভুলতে পারেননি। এই স্মৃতিই নাট্যকাহিনিকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলেছে।

*অনাম্নী অঙ্গনা*তে অম্বিকাদাসী হিরণ্ময়ীও অল্প বয়সে প্রেমে পড়েছিল এক পড়োশীর—চোখে চোখ মিলিয়েছিল। এমনকি এ নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র দাসী অঙ্গনা—তিনিও এক তাঁতির ছেলের প্রেমে পড়েছিলেন। যে ছেলে রঙিন সুতো বোনে, যার চোখে মধুর হাসি, যার কিছু বিত্ত, সঞ্চয় আর কাঞ্চনও ছিল।

প্রথম পার্থ (১৯৬৯) নাটকে দ্রৌপদী-জয়ে প্রত্যাখ্যাত কর্ণ সুতীব্র বেদনায় জর্জরিত হতে হতে বলেছেন, 'আমি কি দ্রৌপদীর বন্ধু হতে চেয়েছিলাম? ... শুধু বন্ধু?' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ২৭৯)। দ্রৌপদীর কাছে বন্ধুতার চেয়ে বেশি কিছু চেয়েছিলেন কর্ণ। সেই চাওয়ার মধ্যে কর্ণের প্রেমই হয়তো সুপ্ত ছিল। কেননা বর্তমান পরিস্থিতিতে দ্রৌপদীর 'রূপের রশ্মি' কর্ণের পক্ষে 'দুঃসহ' আর তাঁর 'ললিত কণ্ঠ' 'উৎপীড়ন'।

অনুরাধা (১৯৩৬) নাটকে প্রেমকে কেন্দ্র করে চতুর্ভুজী-ভুবন সৃষ্টি হয়েছে। অনুরাধাপ্রিয় অনিরুদ্ধের আসার খবর পেয়েও অনুরাধা উচ্ছ্বসিত নয় বরং উৎকণ্ঠিত। অনিরুদ্ধ অনুরাধাকে 'নিরুদ্দেশ আকাশের অভিসারে' ডাকে, কিন্তু অনুরাধা পুরন্দর কাছে 'প্রতিজ্ঞার অমোঘ আজ্ঞায় শৃঙ্খলিত।' এ কারণেই অনিরুদ্ধকে বিদায় জানিয়ে অনুরাধাকে পুরন্দরের জন্য প্রতীক্ষা করতে হয়। অথচ পুরন্দর এসে জানাচ্ছে, সে আনা নামের এক আইরিশ যুবতীকে বিয়ে করেছে। এমনকি আইনত বিবাহিত সেই পত্নীকে পুরন্দর সঙ্গে করেই এনেছে। এমতাবস্থায়

পুরন্দরকে ‘অভিনন্দন’ জানানো ছাড়া অনুরাধার আর কিছুই করার থাকে না। প্রেম এভাবেই নাটকটিতে অপূর্ণতায় পরিণত হয়।

মিলনের ইঙ্গিত দিলেও নাটকের শেষ অঙ্ক অবধি মিলন হয়নি শান্তা-অংশুমানের। ঋষ্যশৃঙ্গ-তরঙ্গিণীর চিরবিচ্ছেদ ঘটেছে। মিলনের পথে সেখানে ‘কর্তব্য’ বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কর্ণ-দ্রৌপদীর মিলনে বাধা নিয়তি আর জন্মপরিচয়। হীরণ্মতী তার পড়োশীকে পায়নি যৌতুক দিতে না পারায় আর দাসত্বের বাধ্যবাধকতায় অঙ্গনা সেই তাঁতি-ছেলেকে পাননি। বুদ্ধদেব বসুর নাটকে প্রেম এভাবেই বিরহে পর্যবসিত হয়—দাম্পত্যের দোরগোড়ায় সে প্রেম পৌঁছায় না।

২.২

বুদ্ধদেব বসুর নাটকে দাম্পত্যজীবনের বিচিত্র প্রতিচ্ছবি প্রকাশ পেয়েছে। নাট্যজীবনের শুরুর দিকে লেখা *লোকটা* (১৯৩৫) নাটকে মীরা-হেমন্ত দম্পতি আর্থিকভাবে খুব সচ্ছল না হলেও তাদের নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারজীবনের ‘অম্লমধুর’ সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু দাম্পত্যজীবনের এই অম্লমধুর প্রাত্যহিকতার প্রতিচ্ছবি দ্বারা বুদ্ধদেব বসুর নাটকের সব সংসার পরিপুষ্ট নয়। সেখানে বেশির ভাগ দম্পতিই বিবাহ-পূর্ব প্রণয়, বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক, অতৃপ্তি, ক্রোধ, হিংসা, প্রতিশোধ কিংবা ব্যক্তিত্ব-বিরোধের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক সংকটে নিমজ্জিত।

মায়া-মালঞ্চ (১৯৪৪) নাটকে দেখা যায় অরিন্দম-হৈমন্তীর অসুখী দাম্পত্যজীবন। দীর্ঘ আট মাস পর অরিন্দম বাড়ি ফিরলেও তার জন্য অপেক্ষা করে না স্ত্রী হৈমন্তী। নিঃসঙ্কোচে মহামায়ার আশ্রমে চলে যায়। একমাত্র পুত্র অরুণ সেও ছন্নছাড়া। দুই মেয়ের মধ্যে মিনি মায়ের ভক্ত। অরিন্দম সংসারটিকে শান্ত রাখার সর্বোচ্চ চেষ্টা করে কিন্তু ব্যর্থ হয়। হৈমন্তীর সঙ্গে তার এতটাই মানসিক দূরত্ব সৃষ্টি হয় যে হৈমন্তীর হাতেই তাকে খুন হতে হয়। স্বামীকে খুন করে হৈমন্তীও সুখী হতে পারে না। সেও মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়ে। শুধু অরিন্দম-হৈমন্তীই দাম্পত্যজীবনে অসুখী তাই নয়, তাদের পুত্র-পুত্রবধূর জীবনও অসুখী।

তপস্বী ও তরঙ্গিণী নাটকে তরঙ্গিণীর স্মৃতি লালন করেই ঋষ্যশৃঙ্গকে প্রায় এক বছর শান্তার সঙ্গে দাম্পত্যজীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। একইভাবে অংশুমানকে মনে রেখেই শান্তা ঋষ্যশৃঙ্গের সঙ্গে দাম্পত্যজীবনের সেই এক বছর অতিবাহিত করেছেন। স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের এই গোপন প্রতারণাটি ঋষ্যশৃঙ্গই অকুণ্ঠ চিত্তে প্রকাশ করেছেন। তিনি তাঁর স্ত্রী শান্তাকে বলেছেন, ‘রাত্রে, অন্ধকারে—তুমি যখন আমার বাহুবন্ধে ধরা দিতে, আমি কল্পনা করতাম তুমি শান্তা নও—সেই অন্য নারী। ... হয়তো তুমিও কল্পনা ক’রতে, আমি ঋষশৃঙ্গ নই, অংশুমান’ (বুদ্ধদেব ২০১৩: ৭৪)। দাম্পত্যজীবনে ঋষ্যশৃঙ্গ-শান্তা দুজনেই অসুখী ও অতৃপ্ত। কারণ, ‘অন্ধকারেও লুপ্ত হয় না স্মৃতি’। চন্দ্রকেতু তার প্রণয়, শ্রদ্ধা, স্বাস্থ্য, বিত্ত এই সবকিছুর বিনিময়ে তরঙ্গিণীকে স্ত্রী হিসেবে পেতে চেয়েছিল, কিন্তু তরঙ্গিণী সেই দাম্পত্যজীবনে আগ্রহ দেখায়নি। কারণ তরঙ্গিণী চায় ‘আনন্দ-প্রতি মুহূর্তে আনন্দ’ আর ‘প্রতি মুহূর্তে রোমাঞ্চ’। চন্দ্রকেতু তাকে সব দিতে পারে কিন্তু প্রেমপূর্ণ এই আনন্দ ও রোমাঞ্চ দিতে পারে না। কেবল জৈবিক ও জাগতিক আকাঙ্ক্ষা দিয়ে গড়া দাম্পত্যজীবন অসাড় হয়ে ওঠার সম্ভাবনাই বেশি। লোলাপাঙ্গীর দাম্পত্যজীবন সেই অসাড়তার জন্যই স্থায়ী হয়নি।

প্রায়শ্চিত্ত (১৯৭০) নাটকে বৃদ্ধের মা যিনি ছিলেন রায়গঞ্জের রানি—যাঁর ছিল মস্ত দিঘি, ঝাউবন, আস্তাবলে ঘোড়া, খাঁচায় পোরা চিতাবাঘ—সেই রানি হুতোমডাঙ্গার ময়দানে এক বরকান্দাজ যুবককে দেখে মুগ্ধ হন এবং বিয়ে করেন। কিন্তু তাঁদের দাম্পত্যজীবন সুখের হয়নি। সেই বরকান্দাজ স্বামী জুয়া, মদ আর 'মেয়েমানুষ' নিয়ে মেতে থাকত। পরিণামে তাঁদের অকালে নিষ্ঠুর মৃত্যুর মুখোমুখি হতে হয়। বরকান্দাজ পিতাকে পুত্রের হাতে জীবন দিতে হয়।

কলকাতার ইলেক্ট্রা (১৯৬৭) নাটকেও এমন অসুখী দাম্পত্যজীবন দেখা যায়। মনোরমা-ইন্দ্রনাথের দাম্পত্যজীবনে অজেন প্রবেশ করে। মনোরমার প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয়েই অজেন তাঁদের সংসারে সে প্রবেশাধিকার পায়। কর্নেল ইন্দ্রনাথ যুদ্ধে গেলে মনোরমা-অজেনের ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়। ইন্দ্রনাথ ফিরে এলে অজেনের চক্রান্ত ও মনোরমার মৌনতায় ইন্দ্রনাথ নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। এরপর মনোরমা-অজেনের দাম্পত্যজীবন শুরু হলেও মনোরমা শেকসপিয়রের লেডি ম্যাকবেথের মতোই কৃতকর্মের জন্য প্রতিনিয়ত অনুশোচনা ও আশঙ্কায় দগ্ধ হতে থাকে। তাঁদের এই দাম্পত্যজীবনও সুখের হয়নি। মনোরমাকে হত্যা করে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিয়েছে শম্পা ও তার ভাই অদ্রিনাথ।

সত্যসন্ধ নাটকে মদ-নারীতে আসক্ত উচ্ছৃঙ্খল জয়ানন্দ 'দেখাশোনার জন্য কাউকে দরকার' ভেবে ঊর্মিলাকে বিয়ে করে। কিন্তু বিয়ের পর ঊর্মিলার প্রতি বাধ্য হয়ে ওঠে জয়ানন্দ। ঊর্মিলার প্রভাবে সে অনেকটা পরাধীন হয়ে যায়। ভাবতে থাকে 'ভালোবাসা মানে দাসত্ব'। সেই দাসত্ব থেকেই রাগ, আক্রোশ আর ঈর্ষাকাতর হয়ে জয়ানন্দ ঊর্মিলাকে খুন করে। পুলিশ ইন্সপেক্টরের কাছে অকাতরে জয়ানন্দ এমন জবানবন্দি দেয়।

বাবু ও বিবি (১৯৬৬) নামক দীর্ঘ একাঙ্কিকায় অসুখী দাম্পত্যজীবনের চিত্র বর্ণিত হয়েছে, যা 'এক বামন দম্পতির অবিশ্বাস্য করুণ কাহিনি। আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যায় বামনবিবির উচ্চতা ও শরীরবৃদ্ধির ফলে বামন বাবুর সঙ্গে তার মানস দূরত্ব বৃদ্ধির ইতিকথা দক্ষতার সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে এই নাটকে। এই দূরত্ব ও জটিলতা শেষ অবধি বামনের আত্মহত্যায় গিয়ে থামে নাটকের অন্তিমে' (লায়েক ২০০৮: ১৩৭)। আসলে বামনবিবির শারীরিক উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার উচ্চাশাও ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, কিন্তু বামনবাবু তার বামনত্ব পরিহার করতে রাজি নয়। সে তার শারীরিক অপূর্ণতাকেই উপভোগ করে। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ক্রমশ দূরত্ব সৃষ্টি হয়। মূলত বুদ্ধদেব বসুর নাটকের দম্পতিরা অসুখী ও অতৃপ্ত। তবে এই অসুখী দাম্পত্যজীবনের জন্য অর্থ নয়, দায়ী তাদের অতৃপ্ত কামনা-বাসনা, অচরিতার্থ ও অপূর্ণ প্রেম। দাম্পত্যজীবনের এই মানসিক অপূর্ণতাজনিত অসুখ যেমন চরিত্রগুলোকে নিরন্তর নিঃসঙ্গ করে তুলেছে তেমনি নাটকগুলোর কাহিনিকে জটিল করেছে।

২.৩

বুদ্ধদেব বসুর নাটকের আরেকটি বিষয় নিঃসঙ্গতা। তাঁর নাটকের অধিকাংশ চরিত্র একা ও নিঃসঙ্গ। রাষ্ট্র, সমাজ এমনকি পারিবারিক জীবনযাপনে তারা স্বাভাবিক থাকলেও অন্তঃপ্রকৃতিতে চরিত্রগুলো ক্রমশ কোলাহল থেকে বিচ্ছিন্ন। বিশ্ব নাট্যসাহিত্যেও ব্যক্তির এ বিচ্ছিন্নতা দুর্লক্ষ্য নয়। 'হ্যামলেট-ম্যাকবেথ-লীয়র কিংবা ইয়াগো-এঞ্জেলো-এডমন্ড প্রত্যেকেই

বিচ্ছিন্ন সত্তা-ব্যক্তিগত লোভ-হিংসা-উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং হীনম্মন্যতাজাত বিচ্ছিন্নতা ও নৈঃসঙ্গ্যের চাপে তারা নিক্ষিপ্ত হয়েছে আত্ম-যন্ত্রণার জটিল গহ্বরে' (বিশ্বজিৎ ২০১৬: ৭১)।

বুদ্ধদেব বসুর *রাবণ* নাটকে শত চেষ্টার পরও রাবণকে ব্যর্থ ও নিঃসঙ্গ হতে হয়। রাবণ সীতাকে বলেছে, 'রাজা বলে ওরা আমাকে পূজা করে, যোদ্ধা বলে আমাকে ভয় করে, আমার আদেশে অফুরন্ত নীল সমুদ্রে ঢেউ ওঠে। ... সব আমি হয়েছি, সব আমি পেয়েছি, এখন আমি ক্লান্ত, আমি একা' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ৪২৮)। নাটকের শেষ পর্যন্ত রাবণের এই একাকিত্ব আর কাটেনি।

তপস্বী ও তরঙ্গিণী নাটকে পিতা বিভাণ্ডকের পৌরোহিত্যে নির্জন বনে যে নিঃসঙ্গ ঋষিজীবন ঋষ্যশৃঙ্গ শুরু করেছিলেন, নাটকের শেষাবধি তাঁর সে নিঃসঙ্গতা কাটেনি। তিনি তপস্বী থেকে স্বামী হয়েছেন, স্বামী থেকে হয়েছেন যুবরাজ, অতঃপর পিতা। তারপরও অনবরত নিঃসঙ্গতায় তার সর্বপ্রহর কেটেছে। তরঙ্গিণী অজস্র পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হয়েছে, কিন্তু তার নিঃসঙ্গ সত্তা ঋষ্যশৃঙ্গের সংস্পর্শে মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠলেও পরে সে আরো একা হয়ে পড়ে। ঋষশৃঙ্গের সঙ্গে বিয়ের কারণে শান্তা যেমন অসুখী ও একা, অংশুমান তেমনি বিচ্ছিন্ন। আবার দাম্পত্যজীবন থেকে অনেক দূরে অবস্থান করেও বিভাণ্ডক একা ও নিঃসঙ্গ। পদস্খলনের মর্মপীড়া আর ব্যর্থ সাধনার পরিতাপে তিনি এক নিঃসঙ্গ মানুষ। শান্তা যেমন বলেছেন, 'আসে যায় দিন-রজনী,/ আসে জাগরণ, তন্দ্রা/ শুধু নেই হৃৎস্পন্দন,/ লুণ্ঠিত সব স্বপ্ন' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ৬০)।

কালসন্ধ্যার (১৯৬৯) শেষে গাণ্ডীবহীন অর্জুন একা আর *প্রথম পার্থ*তে কর্ণ শুরু থেকে নিঃসঙ্গ। রাজমাতা কুন্তীর গর্ভে জন্ম নেওয়া সূর্যদেবের বরপুত্র তিনি। অথচ জন্মগত পরিচয়ের জন্যই তাঁকে অপমানিত হতে হয়েছে বারবার। দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় লক্ষ্যবেধে সমর্থ হওয়ার পরও সেই জন্মের জন্যই তাঁকে নিবৃত্ত হতে হয়। নিয়তির নির্মম পরিহাসে তাঁর মা তাঁর কাছে অপরিচিতা—দৌপদী অস্পৃশ্যা। কর্ণের আক্ষেপ: 'দুই নারী: আমি যাদের ভালোবাসতে পারতাম' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ২৮৭)। ভালোবাসলেও কর্ণের তা প্রকাশের সুযোগ ছিল না। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অন্যতম নিয়ামক কর্ণ তাই বলেছেন: 'শুধু আমি ইচ্ছাহীন, শঙ্কারহিত,/ শুধু আমি অনাবিলভাবে প্রস্তুত।/ তুমি জেনো, আমি দুর্যোধনের যন্ত্র নই,/ কেউ মিত্র নয় আমার, কাউকে আমি শত্রু ব'লে ভাবি না—/ আমি স্বাধীন, আমি নিঃসঙ্গ' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ২৮০)।

অনাম্নী অঙ্গনায় ব্যাসদেবের সঙ্গে এক রাত্রির মিলনের পর চিরবিচ্ছেদে অঙ্গনাকেও এমন নিঃসঙ্গতার মুখোমুখি হতে হয়। *সংক্রান্তি*তে (১৯৭০) ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারী দম্পতি শতপুত্রের মৃত্যুশোক বুকে নিয়ে সময় কাটান। *প্রায়শ্চিত্তে*র কেন্দ্রীয় চরিত্র স্বজনহীন এক নিঃসঙ্গ বৃদ্ধ। অনিরুদ্ধ ও পুরন্দরকে হারিয়ে অনুরাধাও একা। *কলকাতার ইলেক্ট্রায়* পিতৃহত্যার প্রতিশোধের স্পৃহায় শম্পা স্বনির্বাচিত নির্বাসনে। পারিবারিক আবহের মধ্যে থেকেও সেখানে শম্পা শুধু একাই নয়, সবার নিকট থেকে সে স্বেচ্ছায় নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছে। এই বিচ্ছিন্নতা *পাতা ঝ'রে যায়* (১৯৬৬) নাটকেও দেখা যায়। সেখানে সন্তানদের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন এক বৃদ্ধ দম্পতির নিঃসঙ্গ ও বিষণ্নতার অন্তহীন শূন্যতা ধরা পড়ে।

২.৪

বুদ্ধদেব বসুর নাটকে রাজতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র (অধুনা উচ্চবিত্ত অভিজাত) ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের প্রাধান্য। এ ছাড়া কিছু বিত্তহীন মানুষও রয়েছে তাঁর নাটকে, তবে সেইসব মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ওই তিন শ্রেণির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত ও বিকশিত হয়েছে। *একটি মেয়ের জন্য* নাটকে মধ্যবিত্তের প্রাধান্য। *রাবণ* রাজতান্ত্রিক। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*ও তাই। এ নাটকের প্রথম সংকট স্বয়ং রাজা লোমপাদকে কেন্দ্র করে প্রকটিত হয়েছে। রাজকন্যা শান্তার বিয়েকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় সংকটের সৃষ্টি হয়েছে। মূলত এ নাটকের বহিঃসংকট অঙ্গরাজ্যকে কেন্দ্র করেই ঘনীভূত হয়েছে। *কালসন্ধ্যা, অনাম্নী অঙ্গনা, প্রথম পার্থ, সংক্রান্তি* এসব নাটক হস্তিনাপুরের কুরুরাজবংশ ও দ্বারকার যাদবদের কেন্দ্র করে সংগঠিত হয়েছে। সেখানকার সংকটও রাজসিংহাসনকেন্দ্রিক। *ইক্ষাকু সেন্নিনে*র(১৯৭১) ঘটনাও *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*র প্রায় অনুরূপ।

*কলকাতার ইলেক্ট্রা*র কাহিনি উচ্চবিত্তের অভিজাত পরিবারের। *প্রায়শ্চিত্ত*র বৃদ্ধ বর্তমানে নিঃস্ব হলেও তিনি রানিপুত্র—তাঁর মা সামন্ত সমাজের প্রতিভূ ছিলেন। আর *অনুরাধা* বা *সত্যসন্ধ*র জয়ানন্দ এরা মধ্যবিত্ত সমাজের। বুদ্ধদেব বসু তাঁর এসব নাটকে শুধু শ্রেণিচরিত্রই প্রকাশ করেননি, সেই সঙ্গে সংস্কারের নামে শ্রেণিশোষণের রূপটিও তুলে ধরেছেন। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকে রাজসংকট দূর হওয়ার পর বারাঙ্গনা তরঙ্গিণীর খোঁজ আর কেউ রাখেননি। *অনাম্নী অঙ্গনা*তেও তাই। বেদব্যাসের সন্তান ধারণের জন্য শয্যাসঙ্গিনী হতে অম্বিকার পরিবর্তে দাসী অঙ্গনাকে বাধ্য করা হয়েছিল। *প্রথম পার্থ*তে 'সূতপুত্র' কর্ণকেও দুর্যোধন কৌশলে মিত্র বানিয়েছিল।

মূলত তরঙ্গিণী, অঙ্গনা, কর্ণ এঁরা প্রত্যেকেই ব্যবহৃত হয়েছেন যন্ত্রের মতো—উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত কিন্তু উৎপাদিত পণ্য থেকে বিচ্ছিন্ন। রাজতান্ত্রিক বা সামন্ততান্ত্রিক কাহিনিকেও বুদ্ধদেব বসু এভাবে বিশ শতকের পুঁজিবাদী শোষণের শিল্পরূপে পরিণত করেন। তবে বুদ্ধদেব বসুর নাটকে এইসব শোষণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ না থাকলেও শোষণ ও সংস্কারের শৃঙ্খল ভাঙার প্রবণতা দেখা যায়। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে অঙ্গরাজের শারীরিক 'অক্ষমতা' কিংবা ব্রাহ্মণের অসম্মানকে অনাবৃষ্টির কারণ মনে করলে দ্বিতীয় দূত বাঁকা হেসে বিদ্রুপের সঙ্গে বলেছে 'তাহ'লে তো এও বিশ্বাস্য যে আমি এই লোষ্ট্রে পদাঘাত করলে আকাশ থেকে নক্ষত্র খ'সে পড়বে!' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ১৩)।

একটি মেয়ের জন্য নাটকে যৌতুকপ্রথার ভয়ংকর দিক যেমন দেখানো হয়েছে, তেমনি অপূর্ব-সন্ধ্যার মাধ্যমে সে প্রথা ভেঙে বেরিয়ে আসার ইঙ্গিতও নাট্যকার দিয়েছেন। *পাতা ঝ'রে যায়* নাটকেও সংস্কার ও প্রথার সঙ্গে নতুন প্রজন্মের জীবনাচরণের পার্থক্য দেখা যায়। চল্লিশ বছর সংসার করা দম্পতির কাছে নতুন প্রজন্মের সেই নব জীবনাচরণ বিসদৃশ মনে হয়। এভাবেই ব্যক্তির অনির্দিষ্ট আকাঙ্ক্ষা, নিঃসঙ্গতা ও একাকিত্ব, পুঁজিবাদী শ্রেণিশোষণ, সংস্কারের সঙ্গে যুক্তি, প্রথার সঙ্গে প্রত্যাশার দ্বন্দ্বে বুদ্ধদেব বসুর নাটক আধুনিক হয়ে ওঠে।

২.৫

বুদ্ধদেব বসু শৈশব থেকে আমৃত্যু এক যুদ্ধোন্মত্ত পৃথিবী দেখেছেন। তাঁর বয়স যখন ছয় বছর তখন শুরু হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪)। যৌবনে অর্থনৈতিক মন্দার (১৯২৯) মধ্যেই ত্রিশের দশকে বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিস্ট-উত্থান দেখেছেন। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী ভয়ংকর তাণ্ডবনৃত্য শুরু হয়। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩) এবং যুদ্ধোত্তর ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা (১৯৪৬), ভারতভাগ (১৯৪৭), ভারত-চীন যুদ্ধ (১৯৬২), ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ (১৯৬৫), পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য আন্দোলন (১৯৬৬), নকশালবাড়ি আন্দোলন (১৯৬৭)-সহ ভারতের অভ্যন্তরীণ নানা রাজনৈতিক সংকট ও জটিলতা বুদ্ধদেব বসু প্রত্যক্ষ করেন। ১৯৩৮ সালে তিনি 'প্রগতি লেখক সঙ্ঘে'র দ্বিতীয় নিখিলভারত সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য হন বটে, কিন্তু শিল্পকে তিনি রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেননি। বরং তিনি তাঁর নাট্যসাহিত্যে রাজনৈতিক নানা সংকটকে শিল্পিত করে তুলেছেন।

নাট্যজীবনের একেবারে শুরুর দিকে লেখেন *রাবণ* ও *রাম-রাবণের যুদ্ধ* (১৩২৯)। অর্থাৎ যুদ্ধ তাঁর শিল্পীমনকে শুরু থেকে আলোড়িত করেছিল। *রাবণ* নাটকে সীতাকে উদ্ধারের যুদ্ধাংশ হিসেবে রাবণপুত্র ইন্দ্রজিত নিহত হওয়ার খবর শুনে স্বয়ং সীতা বিচলিত হয়ে উঠেছেন। যুদ্ধে লঙ্কার ধ্বংসের শঙ্কায় সীতা ব্যথিত হয়েছেন। এজন্য রামের সঙ্গে সন্ধি করার জন্য তিনি রাবণকে অনুরোধ পর্যন্ত করেছেন। বলেছেন, 'তবু তো নীল সমুদ্রের বুকে রক্ত-কমলের মতো লঙ্কা ফুটে থাকবে' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ৪৪৭)।

*মহাভারতে*র বিশাল ব্যাপ্তি থেকে বুদ্ধদেব বসু যুদ্ধপ্রসঙ্গ নিয়ে তিনটি নাটক লেখেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্ব দিনকে কেন্দ্র করে রচিত হয় *প্রথম পার্থ*, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের শেষ দিন নিয়ে রচিত হয় *সংক্রান্তি* আর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ছত্রিশ বছর পর দ্বারকাবাসীর যে আত্মধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়, বুদ্ধদেব বসু তাকে *কালসন্ধ্যা* নামে রচনা করেছেন। এমনকি *কলকাতার ইলেক্ট্রায়* দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। যেখানে ব্রিটিশ-ভারতের কর্নেল ইন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশের পক্ষে যোগ দিয়েছিলেন এবং যুদ্ধের পর সুভাষ বসুর 'আজাদ হিন্দ ফৌজে' যোগ দেন। সেখান থেকে দীর্ঘ সাত বছর পর স্বগৃহে ফিরে আসার পর থেকে নাট্যকাহিনি শুরু হয়। এ নাটকে যুদ্ধের বাস্তবতা নেই কিন্তু যুদ্ধকালীন এই সাত বছরে তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁর স্থান অজেন দখল করেছে। মনোরমাও তার স্বামী ইন্দ্রনাথের নিকট থেকে মানসিকভাবে অনেক দূর সরে গেছে। মূলত এই তিনটি নাটকে যুদ্ধকে প্রায় দার্শনিক উপলব্ধিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

কালসন্ধ্যায় গান্ধারীর অভিশাপের অনিবার্য পরিণতি ঘটেছে। যদুকুলশাসিত দ্বারকা ধ্বংসের পথে। দ্বারকাবাসী 'কুৎসিত উল্লাসে উন্মাদ' হয়ে উঠেছে। কৃষ্ণের দ্বারকাবাসী বিকৃত যৌনাচার আর পরস্পরের হত্যা-প্রতিহত্যার এক ভয়ংকর তাণ্ডবে মেতে উঠেছে। এই অরাজকতার মধ্যে তারা চীৎকৃত বায়ুবেগে বলে যায়: 'শেষ পর্যন্ত ধ্বংসের মতো আর সুখ নেই!' এই পরিস্থিতিতে সত্যভামার উপলব্ধি:

> ... যেহেতু কুরুক্ষেত্রে
> ভাতৃবধ, গুরুহত্যা, বহু মিথ্যাচার—
> তাও ছিল ধর্মরাজ্য-প্রতিষ্ঠার পূর্বরঙ্গ,
> তাই আজ যাদবের নির্বোধ ভ্রান্তিও
> আর কিছু নয়—শুধু স্থিতির ব্যত্যয়,

সাময়িক, সংশোধনীয়। (বুদ্ধদেব ২০১৩: ১২১)

প্রথম পার্থ নাটকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের প্রাক্কালে কুন্তী কর্ণের কাছে এসেছেন যুদ্ধ বন্ধ করার জন্য নয়, কর্ণকে স্বপক্ষে যোগদানের অনুরোধে। কুন্তী মনে করেন, 'অহিংসা উত্তম ধর্ম, যদি সকলেই তা মেনে চলে—নচেৎ নয়' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ২৫৭)। এমনকি *সংক্রান্তি* নাটকে ধৃতরাষ্ট্র বলেছেন, '... যুদ্ধ কোনো অপরাধ নয়, ধর্ম' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ৩১৭)। আবার একইসঙ্গে তিনি যুদ্ধাবস্থায় যে মানবিক বিপর্যয় ঘটে তাও বলতে ভোলেননি। তিনি বলেন: 'বনভূমিতে মাতঙ্গদল ধাবিত হ'লে/ যেমন লুপ্ত হ'য়ে যায় হরিণ-শশকের পদচিহ্ন,/ তেমনি উৎপাটিত হয় করুণা/ রণক্ষেত্রে, যোদ্ধার প্রতি পদক্ষেপে' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ৩১৭)। যুদ্ধে করুণার এই উৎপাটনের জন্যই *প্রথম পার্থ*তে কর্ণ বলেছেন, 'সব হত্যাই ভ্রাতৃহত্যা', আর কৃষ্ণ আরো স্পষ্ট করে বলেছেন 'সব যুদ্ধই অন্যায়'। যুদ্ধকে অনিবার্য জেনেও তাকে অন্যায় বলে অভিহিত করা শুধু কৃষ্ণেরই উক্তি নয়, বরং তা নাট্যকার বুদ্ধদেব বসুর যুদ্ধবিরোধী চেতনা থেকে উৎসারিত এক মানসপ্রত্যয়।

কালসন্ধ্যার শেষে ক্লান্ত, বিপর্যস্ত ও ব্যর্থ অর্জুনের চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে থাকা ব্যাসদেবের মুখ দিয়ে বেরিয়েছে বুদ্ধদেব বসুর সেই বিশ্বাস: 'এইসব কুশীলব—ক্ষণজীবী প্রাণের ফুৎকার,/ একমাত্র অক্ষরেই নির্ধারিত এদের উদ্ধার' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ১৭০)। অর্থাৎ শোধ, প্রতিশোধ, অর্থ, অস্ত্র কিংবা যুদ্ধ নয়, মানুষের প্রকৃত মুক্তি জ্ঞানে। আর এই জ্ঞানের অভাবে 'ভারতপুরাণের কুরুক্ষেত্র আধুনিক পৃথিবীতে বহুবার অভিনীত হয়েছে—আরো বহুবার অভিনীত হবে।' (মাহবুব ২০২১: ১০১)

৩

বুদ্ধদেব বসু গদ্যনাটকের চেয়ে কাব্যনাট্যে বেশি যশস্বী হয়েছেন। বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেছেন, 'বাংলা কাব্যনাট্যের ধারায় বুদ্ধদেব বসু সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক' (২০১৩: আট)। তিনি *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*, *কালসন্ধ্যা*, *অনাম্নী অঙ্গনা*, *প্রথম পার্থ*, *সংক্রান্তি*, *প্রায়শ্চিত্ত*, *ইক্ষাকু সেন্নিন*, *অনুরাধা*কে কাব্যনাট্য হিসেবে বিশেষভাবে চিহ্নিত করেছেন। এর মধ্যে কাব্যনাট্য হিসেবে সবচেয়ে বেশি আলোচিত *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*।[২] এর কারণ হলো, নাটকটি গদ্য ও কবিতা উভয় রীতির মিশ্রণে লেখা। নাটকটির গদ্য কাব্যব্যঞ্জনায় ঋদ্ধ আর কবিতা গদ্যের মতো বক্তব্যপ্রধান। 'অলৌকিক আনন্দময় শব্দার্থই কাব্য' (সুধীর ১৩৬৫: ১)—এই শর্তে নাটকটির গদ্যও কাব্যভাষায় নির্মিত। আবার অশান্তি ও বিক্ষোভের মধ্যে, ক্ষিপ্র গতি ও তীব্র বিরোধের মধ্যে জীবন-উপস্থাপনে ধরা দেয় নাট্যরূপ (অজিত ২০০৩: ১)। সংলাপপূর্ণ এই রূপও এই নাটকগুলোতে দৃশ্যমান। এই সংলাপ আবার অলংকারে পরিপূর্ণ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে—

উপমা: 'আনো বজ্রের মতো পৌরুষ' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ১৬)

অনুপ্রাস: 'ভ্রাতৃবধ, পিতৃবধ, পুত্রবধ সবই স্বাভাবিক' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ১৩৪)

চিত্রকল্প: 'অনেক দূরে ছোট্ট এক কুটির,/ খড়ের চালে রৌদ্র জ্বলে সোনা,/ সামনে উঠোন, খিড়কিদোরে পুকুর, তেঁতুল তলায় শিউরে ওঠে ছায়া/ দূর, অনেক দূর।' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ১৭৭)

উৎপ্রেক্ষা: 'অতি সুরক্ষিত-যেন সখীবেষ্টিত রাজকন্যা!' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ২১৩)

এমন অলংকারপূর্ণ সংলাপ যেমন দর্শকমনে কবিতার স্বাদ সৃষ্টি করে, তেমনি সংঘাত ও সংক্ষুব্ধতাপূর্ণ কাহিনি নাটকীয়তা সৃষ্টি করে। চরিত্রের সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব এই দুই মেরুর মধ্যে মেলবন্ধন ঘটায়। এখানেই সাহিত্যকর্মগুলো কাব্যনাট্য হয়ে ওঠে। সে বিচারে কাব্যনাট্য হিসেবে *অনুরাধার* কিছুটা শিথিলতা দেখা যায়। এই নাটকটিতে কবিতার ব্যাপ্তি বেশি, নাটকীয়তা কম। অথচ 'কাব্য ও নাটক—উভয়ের শর্ত পূরণ এবং পরস্পরের মধ্যে আত্মস্থ, বাহুল্যবর্জিত ও অপরিহার্য হয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে যে শিল্পমাধ্যম তাই কাব্যনাট্য' (শান্তনু ১৯৮৫: ৯)। অনুরাধার মানসিক পরিবৃত্তের দীর্ঘ বর্ণনা রচনাটির নাট্যরস ক্ষুণ্ন করে। কারণ এলিয়ট তাঁর 'Poetry and Drama' প্রবন্ধে স্পষ্টতই বলেছেন, 'Nothing is Superfluous, and there is no line of poetry which is not justified by its dramatic value.' (1963: 67)

৩.১

বুদ্ধদেব বসুর নাটকে সৃষ্ট চরিত্রগুলো পুরুষতান্ত্রিক সমাজের ভেতর থেকেই বিকশিত হয়। *একটি মেয়ের জন্য* নাটকে মেয়ে সন্ধ্যার জন্য বাবা শিবচন্দ্রকে 'কন্যারক্ষক' ভূমিকা পালন করতে হয়েছিল। যদিও সে ভূমিকা পালন করতে গিয়ে তাকে বিদ্রুপের শিকার হতে হয়। তাছাড়া মেয়ের ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাকে আমরা বেশির ভাগ সময় উদ্বিগ্ন ও দুশ্চিন্তাগ্রস্তই দেখেছি। *তপস্বী ও তরঙ্গিণীর* ঋষ্যশৃঙ্গ চরিত্রটি বুদ্ধদেব বসুর এক অসাধারণ সৃষ্টি। অপাপবিদ্ধ এই তরুণ তপস্বী চরিত্রটি ক্রমাগত বিবর্তিত, বিকশিত ও পরিবর্তিত। শরীর, সংসার, নারী, যৌনতা প্রভৃতি জাগতিক ও জৈবিক অনুষঙ্গ সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ ঋষ্যশৃঙ্গ তরঙ্গিণীর সংস্পর্শে হয়ে ওঠেন 'পুরুষ', শান্তার সান্নিধ্যে হয়ে ওঠেন স্বামী ও পিতা, এমনকি বিয়ের বিনিময়ে যৌবরাজে অভিষিক্ত হন। তিনি ক্রমাগত জগৎ-সংসারের জটিল আবর্তে নিমজ্জিত হতে থাকেন। সেই মোহ থেকে মুক্তির অন্বেষায় নতুন কোনো পথের সন্ধানে আবার বেরিয়ে পড়েন। সেই তুলনায় বিভাণ্ডক, অংশুমান বা চন্দ্রকেতু শুরু থেকেই জাগতিক।

কালসন্ধ্যায় কৃষ্ণ অভিশপ্ত, অর্জুন ক্লান্ত, বিপর্যস্ত ও অক্ষম। *সংক্রান্তিতে* সঞ্জয় শুধুই ভাষ্যকার, ধৃতরাষ্ট্র তাঁর ব্যর্থ জীবনের 'লুপ্ত আশা, উৎকণ্ঠা, আন্দোলন, ক্রন্দন' নিয়েই ব্যস্ত থেকেছেন। *প্রায়শ্চিত্ততে* বৃদ্ধ পরিপূর্ণ হতাশ আর সেই হতাশা থেকেই তিনি নিজ পিতা ও পুত্রের হন্তাকারী হয়ে ওঠেন। *ইক্ষাকু সেন্নিনে* ইক্ষাকু ঋষ্যশৃঙ্গের মতো শুধু তপস্বীই নন, জাদুকরও বটে। *তপস্বী ও তরঙ্গিণীর* শেষে ঋষ্যশৃঙ্গের অনির্দেশ্য যাত্রা পাঠকের কল্পনাকে আরো প্রসারিত করে, কিন্তু ইক্ষাকু সেই তুলনায় অনেকটা ম্লান। তাঁর বিকাশ তপস্যা থেকে জৈবিকতায় এসে রুদ্ধ হয়ে পড়ে। *অনুরাধার* অনিরুদ্ধ ও পুরন্দর দুজনেই আপন ভুবনে আত্মমগ্ন। অনুরাধার জীবনে এদের কেউ স্থায়ী হতে পারে না। *কলকাতার ইলেক্ট্রার* অজেন পরস্ত্রীপ্রেমিক। নিষ্ঠুর ও অমানবিক অজেন সেই পরস্ত্রী মনোরমার স্বামীকে হত্যা করে মনোরমাকে বিয়ে করে। *সত্যসন্ধর* জয়ানন্দও খুনী। স্ত্রীর ভালোবাসার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবার জন্য তার স্ত্রী ঊর্মিলাকে সে খুন করে।

বস্তুত বুদ্ধদেব বসুর নাটকের পুরুষ চরিত্রগুলোর বেশির ভাগই ক্লান্ত, বিপর্যস্ত ও পরাজিত। এক্ষেত্রে *প্রথম পার্থর* কর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি পরাজয় নিশ্চিত জেনেও সমস্ত প্রতিকূলতা, প্রাপ্তি,

লোভ, ভয়ে মোহগ্রস্ত না হয়ে পর্বতের মতো অটল ব্যক্তিত্ব নিয়ে একা দাঁড়িয়ে থাকেন। অঙ্গরাজ হয়েও মৃগয়া যাঁর ব্যসন নয়, নারী যাঁর বিলাস নয়, প্রমোদের প্রতি যিনি উদাসীন, তিনি 'পাণ্ডব নন, কৌরব নন। তাঁর নাম কর্ণ'। যিনি নিজের সম্পর্কে বলতে পারেন 'আমি বিশুদ্ধভাবে আমি'। এই কর্ণই বিশ্বাস করেন, 'যাকে বলে উদ্যম, চেষ্টা, পৌরুষ—যুদ্ধ তারই নামান্তর,/ যুদ্ধহীন কোনো কর্ম নেই জগতে' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ২৫৯)। তিনিই সগৌরবে বলতে পারেন 'আমার ধর্মের নাম মনুষ্যত্ব'। আত্মপ্রতিষ্ঠার সুতীব্র অভিপ্রায়ে কর্ণই বলেছিলেন, 'আমি চাই না উদ্ভিদের মতো জীবন।/ আমার সার্থকতা চেষ্টায়—সংগ্রামে' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ২৯০)। এমন আত্মপ্রত্যয় বুদ্ধদেবের নাটকের আর কোনো পুরুষ চরিত্রের মধ্যে পাওয়া যায় না; এমনকি রাবণও না।

সেই তুলনায় তাঁর নাটকের নারীরা অনেক বেশি উজ্জ্বল, সক্রিয় ও উদ্যমপ্রিয়। শান্তাকে না জানিয়ে তাঁর বিয়ে ঠিক করলে শান্তা সবিস্ময়ে প্রতিবাদ করে বলেছেন, 'আমার বিবাহ! আর আমারই অজ্ঞাতে তার আয়োজন!' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ১৬)। অবশ্য রাজসিদ্ধান্তের কাছে রাজকন্যা শান্তাকে মাথানত করতে হয় কিন্তু তরঙ্গিণী মাথা উঁচু করেই বলেছিল, 'আমি, তরঙ্গিণী, তপস্বীকে লুণ্ঠন করেছিলাম, আর আজ কি এক তুচ্ছ জামাতাকে জয় করতে পারবো না' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ৫৮)। *কালসন্ধ্যার* নারীরা ভীত, সন্ত্রস্ত, কিন্তু *অনাম্নী অঙ্গনার* অঙ্গনা ক্রমাগত বিবর্তিত। কুমারী অঙ্গনা অনিচ্ছা সত্ত্বেও একরাত্রির জন্য ব্যাসদেবের শয্যাসঙ্গিনী হলে মিলনোত্তর অঙ্গনা নিজেকে এক পূর্ণ নারীরূপে অনুভব করেন। মিলনের রাত্রি শেষে উষার পূর্বক্ষণে তাঁর মনে হলো 'শুধু তাঁর নিশ্বাসের ফুৎকারে আমি গর্ভিণী' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ২১৯)। এখান থেকে অঙ্গনা আরেক নারীতে পরিণত হন। সে নারীর ভেতর মাতৃসত্তা জেগে ওঠে। দাসী হয়েও রাজবধূ অম্বিকাকে সরাসরি বলে দেন, 'যাকে আমি বহন করছি আমার দেহের মধ্যে,/ আমি তাকে জন্ম দিতে চাই, লালন করতে চাই/ এই রাজপুরীতে, হস্তিনাপুরে' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ২২১)। মাতৃত্বের অধিকার নিয়ে রাজমাতা কুন্তীও এসেছিলেন তাঁর বিবাহপূর্ব পুত্র কর্ণের কাছে। প্রবল মমতায় কর্ণকে বলেছেন, 'ডাক, আর-একবার মা ব'লে ডাক আমাকে,/ আগে কখনো শুনিনি তোর মুখে, এখন অবিরাম শুনতে চাই' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ২৪৭)। আরেক রাজমাতা গান্ধারীর কণ্ঠে শোনা যায় শত পুত্রের মৃত্যুশোক।

সংক্রান্তিতে ভগ্নজানু নিয়ে চলৎশক্তিহীন অবস্থায় ভূপৃষ্ঠে পড়ে আছে দুর্যোধন। দূর থেকে সে কথা জানতে পেরে গান্ধারীর মুখে এক চিরন্তন মায়ের করুণ আর্তি প্রকাশ পেয়েছে এভাবে, 'কেউ তার কাছে নেই, সঞ্জয়? কেউ তার মুখে জল দেবে না?' ক্রন্দনজড়িত স্বরে তা আরো মর্মন্তুদ হয়ে ওঠে যখন তিনি বলেন, 'বাছা, ফিরে আয়! ফিরে আয় শিশু হ'য়ে আমার কোলে' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ৩৫৮)। এমন মমতাময়ী মায়ের মধ্যেও লুকিয়ে ছিল এক প্রজ্ঞাবতী নারী। স্বামী মহারাজা ধৃতরাষ্ট্রকে গান্ধারী সরোষ তিরস্কারে বলেছেন, 'মহারাজ, তোমার চক্ষু দৃষ্টিহীন ব'লে অন্ধ নও তুমি,/ তুমি প্রজ্ঞাহীন ব'লেই দৃষ্টিহীন' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ২২৭)। নারীর এই অন্তর্তেজ আরো বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ পেয়েছে *কলকাতার ইলেক্ট্রায়*। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দীর্ঘ বারো বছর শম্পা প্রতীক্ষা করেছে। সেই প্রতিশোধস্পৃহায় অটল থেকে বলেছে, 'আমি কারো স্ত্রী হবো না কোনদিন। আমি কারো মা হবো না কোনোদিন' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ৪৮৩)। শম্পা প্রতিশোধের জন্য ছোট ভাই অদ্রিকে অহর্নিশ উত্তেজিত করেছে। অবশেষে অদ্রির হাতে তার মায়ের মৃত্যু হলে শম্পা এক প্রবল প্রশান্তি অনুভব করে।

দালিয়া (১৯৫৪) নাটকে জুলিখাও পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য তার বোন আমিনাকে উৎসাহ দেয়, কিন্তু দালিয়ার প্রেমের কাছে দুই বোন পরাভব স্বীকার করে। ফলে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার উৎসাহ তারা হারিয়ে ফেলে; তবে প্রতিকূলতার মধ্যেও শম্পা সে উৎসাহ হারায় না। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার ব্যাপারে সে একবারে 'সংশপ্তক'। মনোরমাকে হত্যা করেই সে চিরস্থির হয়। তবে মনোরমার এই করুণ মৃত্যু তারই কর্মফল কিন্তু *সত্যসন্ধ*র ঊর্মিলাকে তারই বিকৃত স্বাধীনচেতা স্বামীর হাতে জীবন দিতে হয়েছে। বুদ্ধদেব বসুর নাটকের এইসব নারী একদিকে মমতায় মাতৃতুল্য অন্যদিকে স্বপ্নপূরণে সংশপ্তক। কিন্তু দুঃখ আর অসহায়ত্ব থেকে এঁরা কেউই মুক্ত নন। গান্ধারীর মুখ দিয়ে নাট্যকার তাই বলেছেন, 'কোথায় সেই অন্তঃপুর, যা বেদনারাজ্যের বহির্ভূত?' (বুদ্ধদেব ২০১৩: ৩৫০)

৩.২

গতিশীল মানবজীবন নাটকের জন্য অপরিহার্য। তবে এই গতিশীলতা আধুনিক মানুষের বহির্জীবনে যতটা সক্রিয় অন্তর্জীবনে তার রূপ আলাদা। পারস্পরিক মানসিক বিচ্ছিন্নতা, একাকিত্ব ও নিঃসঙ্গতা আধুনিক মানুষকে ক্রমাগত অন্তর্মুখী করে তোলে। এই অন্তর্মুখীনতার কারণে আধুনিক নাটকে গতি স্থানগত নয়, ভাবগত। সেই গতিও আবার বৃত্তাবদ্ধ। বুদ্ধদেব বসুর *নেপথ্য নাটক* (১৯৭০) নাটকে এই বৃত্তাবদ্ধ গতিই ক্রিয়াশীল। দুই অঙ্কের এই নাটকে কোনো দৃশ্যবিভাজন নেই। সেখানে 'মফস্বল শহরের কোনো বাড়ির বসার ঘরে' নাটকটির কাহিনি বিকশিত হয়। অপরেশ-বনানীর নিঃসঙ্গ জীবনের মধ্যে জম্মু ও ইমলি কিছুটা নতুনত্ব সৃষ্টি করলেও তারা চলে গেলে সেই পূর্বজীবনের একঘেয়েমিতেই তারা আবার আটকে পড়ে। পূর্বাপর সম্পর্কহীন খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন ঘটনা সংলাপের মধ্য দিয়ে অপরেশ-বনানীর নিঃসঙ্গতা, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও টানাপোড়েনকেই প্রকাশ করে। অ্যাবসার্ড নাটকে সাধারণত এ ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। তবে সেই 'অপরিহার্য গতিবেগ' সৃষ্টির অন্যতম উপায় হলো নাট্য-সংঘাত (অজিত ২০০৩: ৩)। সেই সংঘাত যত বহির্মুখী হয়, নাট্যকারের পক্ষে নাটকে গতি আনাটা ততটাই সহজ হয়।

কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর নাটক অন্তর্দ্বন্দ্বপ্রধান। বহির্দ্বন্দ্বের চেয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টির দিকেই তাঁর নাট্যপ্রবণতা বেশি। অন্তর্দ্বন্দ্বের এই সূক্ষ্ম অনুভূতিকে প্রকাশ করার জন্যই হয়তো তিনি নাট্যপ্রকরণ হিসেবে কাব্যনাট্যকে বেছে নিয়েছেন। তবে এই দ্বন্দ্ব তাঁর গদ্যনাটকেও দৃশ্যমান। *কাঠঠোকরা* (১৯৪২) নাটকে মল্লিকা তাঁর বর্তমান প্রেমিক (ভাবী স্বামী) সুমন্ত্রকে নিয়ে অবকাশ যাপনের জন্য যায়। সেখানে তার পূর্বপ্রেমিক সত্যবান (সুমন্ত্রের বন্ধু) উপস্থিত হয়। নিজের অতীত আর বর্তমানের মধ্যে পড়ে মল্লিকা মানসিকভাবে নিষ্পেষিত হতে থাকে। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে স্বামী ঋষ্যশৃঙ্গ ও প্রেমিক অংশুমানকে কেন্দ্র করে শান্তার জীবনেও এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। *পুনর্মিলন* (১৯৬৯) নাটকে ট্রেনের মধ্যে পূর্বপ্রেমিক নীলকণ্ঠ আর বর্তমান 'প্রভু' মদনপালকে কেন্দ্র করে জয়া এমনই পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়। বিবাহপূর্ব পুত্রকে নিয়ে *পুনর্মিলনে*র জয়া আর *প্রথম পার্থে*র কুন্তী অহর্নিশ অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগেছেন। জয়া তাও শিবেন্দুকে সঙ্গে রাখতে পেরেছিল কিন্তু কুন্তী তাও পারেননি। এমনকি কুন্তীপুত্র কর্ণ আত্মদ্বন্দ্বে না ভুগলেও নাটকের পুরোটা সময় আত্মযন্ত্রণায় জর্জরিত ছিলেন। *সংক্রান্তি*তে শোনানো হয়েছে কৌরব-পাণ্ডব যুদ্ধে দুর্যোধনের বীরত্বগাথা, কিন্তু দেখানো হয়েছে এক অক্ষম অন্ধপিতা ধৃতরাষ্ট্র

ও মাতা গান্ধারীর শত পুত্র মৃত্যুর শোকার্ত হাহাকার। বুদ্ধদেব বসুর নাটকে এভাবেই বহির্দ্বন্দ্বের চেয়ে অন্তর্দ্বন্দ্ব মুখ্য হয়ে উঠেছে।

৩.৩

বুদ্ধদেব বসুর নাটকে রসের বিচিত্র সংমিশ্রণ সৃষ্টি হয়েছে। *একটি মেয়ের জন্য* নাটকে সন্ধ্যা-অপূর্ব, *রুণু ও লোটুর প্রেম* নাটকে রুণু-লোটু, *দালিয়া* নাটকে দালিয়া-আমিনার রোমান্টিক সম্পর্ক মধুর রসে প্রকাশ পেয়েছে। তারা প্রত্যেকে যৌবনে উদ্দীপ্ত এবং প্রেমচেতনায় উদ্ভাসিত। আবার চরিত্রের অসঙ্গতিপূর্ণ আচরণকে বিদ্রুপ করার জন্য নাট্যকার কখনো কখনো হাস্যরসেরও ব্যবহার করেছেন। *একটি মেয়ের জন্য* নাটকে কন্যারক্ষক পিতা, *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*র লোলাপাঙ্গী-চন্দ্রকেতু, *সত্যসন্ধ*র উকিলের অসঙ্গতিপূর্ণ দীর্ঘ উক্তির মধ্যে ফুটে উঠেছে হাস্যরস। এমনকি 'যারা গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে, নাটকে নিয়তই অশ্লীলতার গন্ধ পান, বুদ্ধদেব তাদের অশ্লীলতার প্রকৃত স্বরূপ চেনাতে' (অপূর্ব ২০১১: ১৪) *চরম চিকিৎসা* (১৯৬৮) নামে একটি ব্যঙ্গনাটকও লেখেন। নাটকটিতে 'সাহিত্যে অশ্লীলতা' সম্পর্কে প্রবীণ লেখক যে সুদীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছেন তাতে যেমন তথ্য, বুদ্ধি ও জ্ঞানের দীপ্তি প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি শিল্প-সাহিত্যের 'অশ্লীলতা' বিরোধীদের প্রতি রয়েছে সূক্ষ্ম শ্লেষ। এই শ্লেষালংকারের ফলেই সেখানে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়েছে।

হিতাকাঙ্ক্ষী (প্রকাশসাল অজানা) নাটকে বুদ্ধদেব বসু হাস্যরসের মাধ্যমে পরশ্রীকাতর মানুষের মানসিক কদর্য ও অন্তঃসারশূন্যতাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। একইভাবে *বাড়ি চাই, বাড়ি!* (প্রকাশসাল অজানা), *রাম-রাবণের যুদ্ধ, জন্মদিনের উপহার* (১৯৩৩-১৯৩৪), *ধারে বিক্রি নেই* (১৯৪০), *বড়োবাবুর ব্যামো* (১৯৪৩) নামক নাটকগুলোতে এমনই নির্মল হাস্যরস প্রকাশ পেয়েছে। তবে এইসব হাস্যরস খুব সূক্ষ্ম নয়। সমকালীন ব্যক্তি ও সমাজের নানা অসঙ্গতিকে ব্যঙ্গ ও বিদ্রুপ করার প্রয়াসমাত্র। নাটকগুলোও আকারে খুব ছোট।

কিন্তু *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* শুরু হয় ভয়ানক রসে। এরপরে শৃঙ্গার, শৃঙ্গার থেকে মধুর, মধুর থেকে করুণ, এবং করুণ থেকে শান্ত রসে গিয়ে নাটকটি শেষ হয়েছে। *প্রথম পার্থ* ও *সংক্রান্তি* করুণ রসপূর্ণ, *কালসন্ধ্যা* বীভৎস থেকে করুণ আবার করুণ থেকে শান্ত রসে পরিবর্তিত, *কলকাতার ইলেক্ট্রা*য় করুণ, রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস রসের সংমিশ্রণ ঘটেছে। মূলত বুদ্ধদেব বসুর পরিণত বয়সে লেখা নাটকে করুণ রসেরই আধিক্য। এই রসসৃষ্টির উদ্দেশ্যেই নাট্যকার অন্যান্য রসকে নাটকে প্রভাবক হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে যে কোনো রসেরই সুদীর্ঘ উপস্থাপন নাট্যগতিকে যেমন মন্থর করে, তেমনি দর্শক-পাঠকমনে ক্লান্তিরও সৃষ্টি করে। এজন্য এই রসবৈচিত্র্য বুদ্ধদেব বসুর নাটককে সেই পতন থেকে রক্ষা করে। ফলে দেখা যায়, বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাট্যজীবনের শুরুর দিকে মধুর রস ব্যবহার করেছেন। এরপর মধুর রসের রোমান্টিক আবহ থেকে বেরিয়ে তিনি ব্যক্তি ও সমাজের নানা অসঙ্গতিকে তাঁর নাটকে ধারণ করেছেন। সেখানে তিনি বেশি হাস্যরস ব্যবহার করেছেন। হাস্যরসধারা শেষ করে কিছুটা বিরতি নিয়ে ভয়ানক রস দিয়ে আবার শুরু করেন। এরপর করুণ রসের পথ পেরিয়ে শান্ত রসে তাঁর নাট্যযাত্রা স্থিত হয়েছে।

৩.৪

বুদ্ধদেবের নাটকে প্লট সৃষ্টিতেও বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* নাটকটি বৃত্তাকার প্লটে লেখা। রাজ্যের অনাবৃষ্টিজনিত ঘটনা নাটকটির প্রারম্ভপ্লট হলেও পরে ঋষ্যশৃঙ্গ-তরঙ্গিণীর পরিবর্তিত বাস্তবতা প্রধান প্লট হিসেবে প্রতীয়মান হয়। এ ছাড়া বিভাণ্ডক-কাহিনি, শান্তা-অংশুমান, চন্দ্রকেতু-লোলাপাঙ্গীর জীবনবাস্তবতা সহপ্লট হিসেবে স্থান পেয়েছে। নাট্যকার প্রধান প্লটের সঙ্গে এই সাবপ্লটগুলো একসূত্রে মিলিয়ে দেন নাটকের শেষাঙ্কে। *পুনর্মিলন* নাটকেও এ ধরনের প্লটপ্রবণতা দেখা যায়। *প্রথম পার্থ*তে কর্ণকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে কৃষ্ণ, কুন্তী ও দ্রৌপদীর তিনটি প্লট। *কালসন্ধ্যার* ঘটনা দ্বারকা থেকে হস্তিনাপুরে সরল রেখায় এগিয়ে গেছে।

সত্যসন্ধ নাটকে বৃদ্ধ তার পিতার বীভৎস অতীত থেকে বর্ণনার মধ্য দিয়ে পুত্রের কাছে পৌঁছেছেন—অথচ একই জায়গায় তিনি বসে থাকেন আর গল্পের মধ্য দিয়ে অতীত থেকে বর্তমানে দর্শককে পরিভ্রমণ করান। এক্ষেত্রে নাট্যকার চেতনাপ্রবাহরীতির ব্যবহার করেছেন। নাটকের অঙ্কবিভাজন বা দৃশ্যগত উপস্থাপনায় নাট্যকার 'পিরামিড তত্ত্ব'কে বেশি ব্যবহার করেছেন। যেমন, *মায়া-মালঞ্চ* নাটক তিন অঙ্কে সমাপ্ত। নাটকটির শিখরসন্ধি দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে আরম্ভ হয়ে তৃতীয় দৃশ্য হয়ে তৃতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে শেষ হয়েছে। তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্যে নাট্যকাহিনির গ্রন্থিমোচন ও উপসংহার ঘটেছে। কিন্তু *কুড়ি বছর আগে অথবা পরে* (১৯৭০) বা *পঁচিশ বছর পরে অথবা আগে* (১৯৭১) নাটকদুটোতে এই বিন্যাস রক্ষিত হয়নি। শুধু সংলাপের ধরনটুকু বাদ দিলে নাটকদুটি গল্প হয়ে ওঠে। অর্থাৎ ঘটনার চেয়ে বক্তব্য বড় হয়ে উঠেছে। বিবৃতি বেশি হলেও *কলকাতার ইলেক্ট্রায়* বক্তব্য ও ঘটনার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। আগে উল্লেখিত নাটকদুটির গঠনগত শিথিলতা এখানে নেই। বিভিন্ন চরিত্রের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ ও টানাপোড়েন নাটকটিতে শান্তার বিপর্যস্ত বাস্তবতাকে প্রকাশ করতে সহযোগিতা করেছে।

বুদ্ধদেব বসুর অন্যান্য নাটকও এভাবে একক চরিত্র প্রধান হয়ে ওঠে। ঋষ্যশৃঙ্গ, কর্ণ, কৃষ্ণ, অঙ্গনা, জয়া কিংবা শম্পা বুদ্ধদেব বসুর নাটকে যেভাবে পূর্ণ বিকশিত, অন্য চরিত্রগুলোর বিকাশ সেক্ষেত্রে মাঝপথেই থেমে যায় কিংবা অনির্ণেয় থাকে। প্রতিপক্ষ হিসেবে অন্য চরিত্রের চেয়ে প্রধান চরিত্রগুলোর অন্তর্ভেদই মুখ্য ভূমিকা পালন করে। অবশ্য *তপস্বী ও তরঙ্গিণী* বাদে বুদ্ধদেব বসুর বেশির ভাগ নাটকই স্বল্প চরিত্র, অঙ্ক ও আয়তনবিশিষ্ট।

৩.৫

বুদ্ধদেব বসুর নাটকের বিশেষ প্রবণতা হলো নাট্যকাহিনির সমাপ্তিতে অনির্দিষ্টতা। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*তে ঋষ্যশৃঙ্গ যেভাবে আশীর্বচনের মধ্য দিয়ে শান্তার কুমারীত্ব ফিরিয়ে দিয়ে নাট্যকাহিনি থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন, তা অনেকটা যেমন মেলোড্রামাটিক তেমনি তাঁর যাত্রাও অনির্দেশ্য। *পুনর্মিলন* নাটকের জয়া তাও মারা গেছে, কিন্তু অধিকারহীন অঙ্গনা, নিঃসঙ্গ কর্ণ, অস্ত্রহীন অর্জুন, অপ্রকৃতস্থ অদ্রি, সঙ্গীহীন অনুরাধাদের জীবন শেষ পর্যন্ত অমীমাংসিত। নাটকের শেষ হচ্ছে, কিন্তু কাহিনির শেষ হচ্ছে না। *সত্যসন্ধ*র জয়ানন্দের মতো এঁরা সবাই সত্য-মিথ্যার ঠিক মাঝখানে পেন্ডুলামের মতো ঝুলে থাকেন। নাট্যমঞ্চে মীমাংসা না করে তার ভার নাট্যকার দর্শকমনে তুলে দেন। দর্শকও পান এক অনির্বচনীয় অতৃপ্তি। এখানেই বুদ্ধদেব বসুর বিশেষত্ব।

তবে এক্ষেত্রে অস্পষ্টতার ব্যাপারটি থেকে যায়। জনশ্রুত হওয়ায় বুদ্ধদেব বসুর নাটকে ব্যবহৃত পৌরাণিক কাহিনির পরিণতি পাঠকের জ্ঞাত কিন্তু যেখানে পুরাণ বিনির্মিত হয়েছে (*রাবণ, প্রথম পার্থ, অনাম্নী অঙ্গনা, তপস্বী ও তরঙ্গিণী*) কিংবা নাট্যকারের মৌলিক কাহিনি নাট্যবদ্ধ হয়েছে (যেমন *কাঠঠোকরা*) সেখানে নাটকের অস্পষ্ট পরিণতি বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করে। *কাঠঠোকরা* নাটকে ধামাই জঙ্গলে ঘুরতে যায় মল্লিকা-সুমন্ত্র-সত্যবান। কিন্তু মল্লিকা ও সুমন্ত্র ফিরে আসে। সত্যবানের হারিয়ে যাওয়াটা নিশ্চয়ই শোকাবহ, কিন্তু সুমন্ত্র যখন মল্লিকাকে বলে, 'তোমার মন কাকে চায় তা যদি জানতেই তবে প্রথমেই সে কথা বললে না কেন? তাহলেই তো ...' (শাহেদ ২০০৮: ৬৯২)। সংলাপটির এই শেষ শব্দদুটির মধ্যে নাট্যকার একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দিয়ে দেন—আর তা হলো সুমন্ত্র সত্যবানকে খুন করতে পারে। কিন্তু নাট্যকার তা স্পষ্ট করেননি। ঋষ্যশৃঙ্গ বা তরঙ্গিণীর গন্তব্য, অনুরাধার শেষাশ্রয় কিংবা *পাতা ঝ'রে যায়* নাটকের নিঃসঙ্গ বয়স্ক দম্পতির ভবিষ্যৎও অস্পষ্ট।

৪

যে কয়টি নাটক বুদ্ধদেব বসুকে বাংলা নাট্যসাহিত্যে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছে, তার প্রায় সবগুলোরই কাহিনি *রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড, ওডিসি*সহ বিভিন্ন যুগের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে সংগৃহীত। বিশেষ করে 'বুদ্ধদেব বসু কাব্যনাট্যগুলিতে ভারতীয় পুরাণের অনুষঙ্গে, কাহিনীর অন্তরালে প্রসারিত শাশ্বত মানবাভিজ্ঞতার সঙ্গে ব্যক্তিক অনুভব ও স্ব-কালের জীবনজটিলতাকে যুক্ত ক'রে অমেয় রহস্য ও অনন্ত ইঙ্গিতে গূঢ় করে তুলেছেন' (পুষ্পেন্দুশেখর ২০১৩: ৯৬)। সে ইঙ্গিতে *রাম-রাবণের যুদ্ধ* ও *রাবণ* নাটকের আখ্যান বাল্মীকি রচিত *রামায়ণের*। তবে *রামায়ণের* রাক্ষসরাজ বুদ্ধদেব বসুর নাটকে সুখ-শোক-প্রেম-ব্যর্থতা আর নিঃসঙ্গতায় নিমজ্জিত এক আধুনিক মানুষে পরিণত হয়েছে। বাল্মীকির রাক্ষস-রাবণ বুদ্ধদেবের নাটকে মানুষ-রাবণে পরিণত হয়েছে।

তপস্বী ও তরঙ্গিণী বুদ্ধদেব বসুকে শীর্ষ নাট্যখ্যাতি এনে দেয়। নাটকটির 'কাহিনীর মূল নিহিত আছে পুরাণ, সংস্কৃত *রামায়ণ, মহাভারত* ও বৌদ্ধজাতক কাহিনীতে। ... এ ছাড়াও বুদ্ধদেব Jessie Weston রচিত *From Ritual to Romance* বইটির সাহায্যও নিতে পারেন' (লায়েক ২০১৬: ১২)। *কালসন্ধ্যার* কাহিনি বেদব্যাস রচিত *মহাভারতের* মৌষল পর্ব থেকে আহৃত। *অনাম্নী অঙ্গনার* ঘটনা *মহাভারতের* আদিপর্বের বিদুরের জন্ম-বিবরণে আছে (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ২০১৬: ১০৮)। *প্রথম পার্থর* ঘটনাংশ মহাভারতের উদ্যোগপর্ব থেকে নেওয়া। *সংক্রান্তির* কাহিনি *মহাভারতের* শল্যপর্বের গদাযুদ্ধ পর্বাধ্যায় থেকে সৌপ্তিক পর্বের দুর্যোধনের মৃত্যু পর্যন্ত। *প্রায়শ্চিত্ত* নাটক উইলিয়াম বাটলার ইয়েটসের (১৮৬৫-১৯৩৯) *Purgatory* নাটকের অনুলিখন। *ইক্কাকু সেন্নিন* জাপানি নাট্যকার কোম্পারু মোতায়াসুর (১৪৫৩-১৫৩২) 'ইক্কাকু সেন্নিন' নামক *নো* নাটকের অনুলিখন (অপূর্ব ২০১১: ১৯)। *কলকাতার ইলেক্ট্রা* গ্রিক পুরাণের কাহিনি।

পৌরাণিক নাট্যরচনায় বুদ্ধদেব বসু *মহাভারত* দ্বারা সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন। এর কারণটিও স্পষ্ট। তিনি মনে করেন, এই গ্রন্থে 'সব দ্বন্দ্ব ও সংশয় ও সম্ভবপর সমাধান' প্রবিষ্ট

হয়েছে (বুদ্ধদেব ১৪০৮: ২৫)। তবে পৌরাণিক নাট্যরচনায় তিনি নাট্যকাহিনিকে পুরাণের সুদূর অতীতের মধ্যেই আবদ্ধ রাখেননি, বরং চরিত্রের অন্তর্জটিলতায়, ব্যক্তিত্বের বিকাশে, রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতে এবং সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক সংকট রূপায়ণে নাটকগুলোকে সমকালীন করে তুলেছেন। ঋষ্যশৃঙ্গের জৈবিক আত্মবিকাশ, তরঙ্গিণীর অপ্রতিরোধ্য আত্মপ্রচেষ্টা, অঙ্গনার দৃঢ়তা, গান্ধারী-কুন্তীর মাতৃত্ব, কর্ণের নিঃসঙ্গতা—এগুলো বুদ্ধদেব বসুর নিজস্ব সৃষ্টি। তরঙ্গিণী বা অঙ্গনা পুরাণে নামহীন ও অবহেলিত, কিন্তু বুদ্ধদেব বসুর নাটকে উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত। আবার উদ্যোগপর্বে 'কৃষ্ণ-কর্ণ সংবাদ' ও 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' আছে কিন্তু সেখানে 'কর্ণ-দৌপদী সংবাদ' নেই (কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ১৪০৯: ৩৪৯-৩৫৩)। অথচ *প্রথম পার্থ*তে নাট্যকার সে সাক্ষাৎও ঘটান।

আবার জাপান, আয়ারল্যান্ড ও গ্রিসের পুরাণ-সাহিত্য থেকে তিনি যেসব কাহিনি গ্রহণ করেছেন, সেসব কাহিনির মূলাংশকে অবিকৃত রেখে ঘটনা-চরিত্র ও বাস্তবতাকে ভারতবর্ষীয় ও সমকালীন করে তুলেছেন। যেমন, ইলেক্ট্রা বিখ্যাত ট্রয়যুদ্ধের সেনাপতি আগামেমননের কন্যা। ট্রয় যুদ্ধের অনুষঙ্গকে নাট্যকার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অনুষঙ্গে পরিণত করলেন আর গ্রিসের ইলেক্ট্রাকে 'কলকাতার ইলেক্ট্রা'য় রূপ দিলেন। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ-স্পৃহায় সংশপ্তক এই নারী সুদূর গ্রিস থেকে এসে বুদ্ধদেবের নাটকে এক বাঙালি কন্যায় পরিণত হলেন, আর সেইসঙ্গে প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক হিসেবেও প্রতিষ্ঠা পেলেন। বুদ্ধদেব বসুর নাটকে পুরাণ এভাবেই বিনির্মিত হয়েছে, আর এসব কাহিনি প্রাচীন হয়েও সমকালীন হয়ে উঠেছে।

বুদ্ধদেব বসু নিজেরই বেশ কিছু গল্প ও উপন্যাসকে যেমন নাট্যরূপ দিয়েছেন (এই প্রবন্ধের টীকা অংশ দ্রষ্টব্য) তেমনি সমকালীন সাহিত্যের মধ্যেও নাট্যরূপের সন্ধান করেছেন। এক্ষেত্রে তাঁর *দালিয়া* (১৯৫৪) নাটকটির উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প 'দালিয়া' (১২৯৮) অবলম্বনে তিনি *দালিয়া* নাটকটি রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের মুঘল সাম্রাজ্যের সতেরো শতকের ইতিহাস অবলম্বনে গল্পটি লেখেন। বুদ্ধদেব বসু সেই গল্পের কাহিনিকে প্রায় অবিকৃত রেখে দ্বন্দ্ব, সংলাপ, শ্লেষ, কৌতূহল, উৎকণ্ঠা আর আকস্মিকতার মেলবন্ধনে তাকে নাটকে পরিণত করেন। তিনি ইতিহাস নয়, রবীন্দ্রনাথের গল্পটিকে অনুসরণ করেছেন। এ কারণে পৌরাণিক নাটকগুলোর মতো এখানে আখ্যানের বিনির্মাণ ঘটেনি। তবে আঙ্গিক আর উপস্থাপন-কৌশলের বিনির্মাণ ঘটেছে। নিকোলাই গোগোলের (১৮০৯-১৮৫২) 'দ্য ওভারকোট' (১৮৪২) গল্প অবলম্বনে রচিত *ওভারকোট* (১৯৪০) নাটকেও বুদ্ধদেব বসু একই কৌশল প্রয়োগ করেছেন।

৫

বুদ্ধদেব বসুর নাট্যসমগ্র বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, তাঁর নাট্যজীবন তিনটি পর্বে বিভাজিত। প্রথম, প্রস্তুতি পর্ব (১৯২৯-১৯৩৯)। এ পর্বে বুদ্ধদেব বসু পুরোমাত্রায় রোমান্টিক। দ্বিতীয়, নিরীক্ষা পর্ব (১৯৪০-১৯৪৯)। এ পর্বটিকে বুদ্ধদেব বসুর নাট্যজীবনের সন্ধিপর্বও বলা যায়। এরপর দীর্ঘ দশ বছরের বিরতি দিয়ে তাঁর নাট্যজীবনের তৃতীয় ও পরিণত পর্ব (১৯৬১-১৯৭১) শুরু হয়। প্রথম পর্বের নাটকে যৌবনদীপ্ত প্রেম ও তারুণ্যের উচ্ছ্বাস প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় পর্বের নাটকে সামাজিক নানা অসঙ্গতি প্রাধান্য পেয়েছে। এক্ষেত্রে তিনি নাটকে স্থূল

বিষয় ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের আশ্রয় নিয়েছেন। তবে এ পর্বেই তিনি তাঁর ভবিষ্যৎ নাট্যপথ নিয়ে ভাবতে থাকেন। ফলে নিরীক্ষামূলকভাবে তিনি এ পর্বে দু-একটি সূক্ষ্মভাবসম্পন্ন নাটক লেখেন। তৃতীয় পর্বে এসে এই ভাবকেই তিনি তাঁর নাটকের প্রধান বিষয় করে তোলেন। সেই বিষয়ের সঙ্গে পৌরাণিক আবহ ও আখ্যানের মেলবন্ধনে তিনি নাট্যসফলতার শীর্ষ স্পর্শ করেন। তাঁর এ সময়ে রচিত নাটক বিশ শতকের আধুনিক মানুষের অন্তর্দপণ হয়ে ওঠে, যার বাস্তবতা আজও প্রাসঙ্গিক।

বুদ্ধদেব বসু বিশের দশকের শেষে (১৯২৯) নাট্যরচনা শুরু করলেও তাঁর সবচেয়ে সফল ও জনপ্রিয় নাটক মূলত ষাটের দশকে রচিত হয়েছে। এ সময় বাংলা নাটকে সমকালীন রাজনৈতিক বিষয়াদির যে প্রাধান্য ছিল, বুদ্ধদেব বসু তাঁর নাটককে সেই কোলাহল থেকে মুক্ত করে পুরাণের ধূসর জগতে নিয়ে যান। সেই জগৎ থেকে রসদ সংগ্রহ করে তিনি তাঁর নাটককে যুগের চাহিদা মিটিয়েই যুগোত্তীর্ণ করে তুলেছেন। বহির্বাস্তবতার চেয়ে মানুষের অন্তর্বাস্তবতার সূক্ষ্ম সংঘাত, উৎকণ্ঠা, আকস্মিকতা আর ব্যঞ্জনাময় সংলাপ-প্রয়োগে তিনি সুনিপুণ সব নাট্যশিল্প সৃষ্টি করেন। বাংলা নাটকের ইতিহাসে বুদ্ধদেব বসু সেই নৈপুণ্যগুণেই চিহ্নিত হয়ে থাকবেন।

টীকা

১. বুদ্ধদেব বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী থাকাকালে ১৯২৯ সালে লেখেন একাঙ্ক *একটি মেয়ের জন্য*। নাটকটি ঐ বছরই চুম্বনের একটি দৃশ্য বাদ দিয়ে জগন্নাথ হলে মঞ্চস্থ হয় এবং *নবশক্তি* পত্রিকার ফাল্গুন ১৩৩৬ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ সময়ে (১৯৩০) বুদ্ধদেব বসু *রাবণ* নাটক লেখেন। *রাবণ* নাটকটি মঞ্চস্থ হয়নি, তবে নাটকটি দুটি দৃশ্য বাদ দিয়ে *সানন্দা* পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে তিন কিস্তিতে প্রকাশিত হয় (০৭.০৩.১৯৯১) (অপূর্ব ২০১১: ১৩)। ১৯৩৩ সালে রচিত ও প্রকাশিত হয় তাঁর নাট্যোপন্যাস *অনেক রকম*। ১৯৩৩ সালেই *পূর্বাশা* পত্রিকার জন্য বুদ্ধদেব বসু লেখেন *রুণু ও লোটুর প্রেম* নামক একটি নীতিমূলক প্রহসন। ১৯৩৩-১৯৩৪ সালে লেখেন *জন্মদিনের উপহার* নাটক। ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত *ঘরেতে ভ্রমর এলো* গল্পগ্রন্থে সংকলিত হয় গল্পনাট্য *লোকটা*। এ বছরই *লিটল থিয়েটারের* জন্য লেখা হয় *অনুরাধা*। নাটকটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৭ সালে। ১৯৪০ সালে নিকোলাই গোগোলের গল্প অবলম্বনে লেখেন *ওভারকোট*। একই বছর দেব সাহিত্য কুটির প্রকাশিত পূজাবার্ষিকী *মায়ামুকুরে* প্রকাশিত হয় *ধারে বিক্রি নেই* নাটক। ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে প্রকাশ পায় *রাম-রাবণের যুদ্ধ* (ইকবাল ২০২২: ১৪২)। ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে বার্ষিক *বৈশাখী*তে প্রকাশিত হয় *কাঠঠোকরা*। ১৯৪৩ সালে অভিনীত হয় *মায়া-মালঞ্চ* আর নাটকটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায় ১৯৪৪ সালে। মূলত এই নাটকটি (*মায়া-মালঞ্চ*) ১৯৪২ সালে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসুর *কালো হাওয়া* উপন্যাসের নাট্যরূপ। ১৩৫০ বঙ্গাব্দে *মৌচাক* পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয় বুদ্ধদেব বসুর *বড়োবাবুর ব্যামো*। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটগল্প 'দালিয়া' অবলম্বনে বুদ্ধদেব বসু ১৯৫৪ সালে রচনা করেন নাটক *দালিয়া*। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত *কিশোর সঞ্চয়ন* গ্রন্থে বুদ্ধদেব বসুর কিশোরনাটক *বাড়ি চাই, বাড়ি* সংকলিত হয়। তবে নাটকটির রচনাকাল জানা যায়নি। ১৯৬৬ সালে রচিত ও প্রকাশিত হয় *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*। এই নাটকের জন্য বুদ্ধদেব বসুকে ১৯৬৭ সালে সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার প্রদান করা হয়। একই বছর প্রকাশিত হয় *বাবু ও বিবি* (১৯৬৬), *পাতা ঝ'রে যায়* (১৯৬৬)। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয় *চরম চিকিৎসা, কলকাতার ইলেক্ট্রা* ও *সত্যসন্ধ*। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে প্রকাশ পায় *কালসন্ধ্যা*। ১৯৭০ সালে *নেপথ্য নাটক, পুনর্মিলন, অনাম্নী অঙ্গনা* ও *প্রথম পার্থ* প্রকাশ পায়। ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত হয় *সংক্রান্তি, প্রায়শ্চিত্ত, ইক্ষ্বাকু সেন্নিন*। অবশ্য নাটক তিনটি রচিত হয়

১৯৭০-১৯৭১ সালের মধ্যে। ১৯৭০ সালে *কুড়ি বছর আগে অথবা পরে-একটি নাটকের খশড়া* নামে একটি নাটক প্রকাশিত হয় *শারদীয়া সুন্দরী* পত্রিকায় আর *পঁচিশ বছর পরে-অথবা আগে* নামে নাটকটির পূর্ণাঙ্গ রূপ ১৯৭১ সালে *কলকাতা* পত্রিকায় প্রকাশ পায়। ১৯৯৯ সালে বিকল্প প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত *পাতা ঝ'রে যায় ও অন্যান্য নাটক* গ্রন্থে *হিতাকাঙ্ক্ষী* নামে একটি নাটক পাওয়া যায়। নাটকটির রচনাকাল বা প্রথম প্রকাশকাল জানা যায়নি। তবে নাটকটি বুদ্ধদেব বসুর নাট্যজীবনের একেবারে শুরুর দিকের রচনা বলে অনুমিত। (দময়ন্তী ২০১৩: ৫২৯-৫৩৫)

২. বুদ্ধদেব-বিশেষজ্ঞ বিশ্বজিৎ ঘোষ *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*কে কাব্যনাট্য বলেছেন (২০০৮: আট-নয়)। মাহবুব সাদিকও নাটকটিকে বিবেচনা করেছেন কাব্যনাটক হিসেবে (২০১০: ৪৬৪)। অপূর্ব দে প্রথাগতভাবে না হলেও নাটকটিকে গভীর অর্থে কাব্যনাট্য বলেছেন (২০১১: ১৬)। অজিতকুমার ঘোষ *তপস্বী ও তরঙ্গিণী*কে পুরোপুরি নয়, আংশিক কাব্যনাট্য বলেছেন (১৪২৩: ৪৬৪)। লায়েক আলি খান নাটকটিকে কাব্যনাটক বলেছেন (২০১৬: ১২৫)। শান্তনু কায়সারও নাটকটিকে কাব্যনাট্য বলেছেন (১৯৮৫: ৪১)। বর্তমান প্রবন্ধেও নাটকটির কাব্য ও নাট্যগুণ বিবেচনায় এটিকে কাব্যনাট্য হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে।

সহায়কপঞ্জি

অজিতকুমার ঘোষ (২০০৩)। *নাটকের কথা*। কলকাতা: সাহিত্য লোক

অজিতকুমার ঘোষ (১৪২৩)। *বাংলা নাটকের ইতিহাস*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

অপূর্ব দে (২০১১)। *তপস্বী ও তরঙ্গিণী পুরাণের নবভাষ্য* (সম্পাদিত)। কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস (১৪০৯)। *মহাভারত* (রাজশেখর বসু অনূদিত)। কলকাতা: এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস (২০১৬)। *মহাভারত* (কাশীরাম দাস অনূদিত ও বেণীমাধব শীল সম্পাদিত)। কলকাতা: অক্ষয় লাইব্রেরি

দময়ন্তী বসু সিং (২০১৩)। 'নাটক প্রসঙ্গে', *বুদ্ধদেব বসুর নাটক সমগ্র ১* (দময়ন্তী বসু সিং সম্পাদিত)। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

দময়ন্তী বসু সিং (২০১৩)। 'নাটক প্রসঙ্গে', *বুদ্ধদেব বসুর নাটক সমগ্র ২* (দময়ন্তী বসু সিং সম্পাদিত)। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

ধনঞ্জয় দাশ (১৯৯২)। 'বাঙলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার সূচনা ও সংগঠিত আন্দোলনের আদিপর্ব', *বাঙলার সংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার ধারা* (ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত)। কলকাতা: অনুষ্টুপ

পুষ্পেন্দুশেখর গিরি (২০১৩)। *বুদ্ধদেব বসুর তপস্বী ও তরঙ্গিণী নবমূল্যায়ন*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

ফরহাদ খান (২০১২)। *প্রতীচ্য পুরাণ*। ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা

বিশ্বজিৎ ঘোষ (২০১৬)। *নৈঃসঙ্গ্যচেতনা*। ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন

বুদ্ধদেব বসু (২০১৩)। *নাটক সমগ্র ১* (দময়ন্তী বসু সিং সম্পাদিত)। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

বুদ্ধদেব বসু (২০১৩)। *নাটক সমগ্র ২* (দময়ন্তী বসু সিং সম্পাদিত)। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং

বুদ্ধদেব বসু (২০১৩)। *কাব্যনাট্যসমগ্র* (বিশ্বজিৎ ঘোষ সম্পাদিত)। ঢাকা: অবসর প্রকাশনা সংস্থা

বুদ্ধদেব বসু (১৪০৮)। *মহাভারতের কথা*। কলকাতা: এম সি সরকার এ্যান্ড সন্স

ভূঁইয়া ইকবাল (২০২২)। *বুদ্ধদেব বসু*। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস

মাহবুব সাদিক (২০১০)। 'বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য: প্রসঙ্গ পুরাণ', *আমি কে, তা মনে রেখ বুদ্ধদেব বসু জন্মশতবর্ষ স্মারক সংকলন* (সফিকুন্নবী সামাদী, শহীদ ইকবাল ও অন্যান্য সম্পাদিত)। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: বাংলা গবেষণা সংসদ

মাহবুব সাদিক (২০১১)। *বুদ্ধদেব বসুর কবিতা: বিষয় ও প্রকরণ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

মাহবুব সাদিক (২০২১)। *বুদ্ধদেব বসুর কাব্যনাট্য একালের জীবনভাষ্য*। ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী

মোঃ জাকিরুল হক (২০০৭)। *দুই বাংলার নাটকে প্রতিবাদী চেতনা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

লায়েক আলি খান (২০১৬)। *বুদ্ধদেব বসুর তপস্বী ও তরঙ্গিণী কয়েকটি প্রসঙ্গ*। কলকাতা: প্রজ্ঞা বিকাশ

শান্তনু কায়সার (১৯৮৫)। *কাব্য নাটক*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

সুধীরকুমার দাশগুপ্ত (১৩৬৫)। *কাব্যালোক* প্রথম খণ্ড। কলকাতা: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লি

সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ (২০০৮)। *উত্তরাধিকার* ৩৬ বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা (সম্পাদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

T S Eliot (1963). *Selected Prose* (Edited by John Hayward). Great Britain: Penguin books

T S Eliot (2016). *The Waste Land.* New Delhi: Rama brothers